ভ বা নী প্র সা দ মু খো পা ধ্যা য়

ফুইগিয়ানের দেশে: ৩

তখনও বড়োদিনের আবেশ রয়ে গেছে। একদিন পরেই 'বিগ্‌ল্' ছাড়ার কথা, তারই তোড়জোড় চলছিল কয়েকমাস ধরে। দু'দিনে মনে হচ্ছিল সব যেন থমকে গেছে। জাহাজের নাবিকরাও সকলের মতো মেতে উঠেছিল বড়োদিনের হই-হুল্লোড়ে, সঙ্গে মাত্রাছাড়া মদ্যপান। এ-সব কারণেই ২৬ তারিখটাও কেটেছিল ছুটির মেজাজে। চার্লস-এর এ-সব যে খুব পছন্দের ছিল, তা নয়। চার্লস-এর মন অনেক আগেই ভেসে গেছে অতলান্তিকের সুনীল জলে। বড়োদিনের আড়ম্বরের ঘনঘটা অল্প হলেও ধূসরতার প্রলেপ ফেলেছিল সেই মনটায়। অনেক সময় পছন্দ-অপছন্দ কিংবা ভালোলাগা-খারাপলাগার ভাবনাগুলোকে দমবন্ধ করে রেখে অসহায়ত্বকেই মেনে নিতে হয়— চার্লস-এর বড়োদিনের সময়গুলো ওভাবেই কেটেছিল।

পরের দিনটা ছিল বেশ মনোরম, সকাল থেকে পুবের হাওয়া বইছিল, সকাল এগারোটা নাগাদ নোঙর তোলা হলো বটে কিন্তু তখনও যে সব ঠিকঠাক ছিল— এমন বলা যাবে না। তবু সবকিছু নিয়েই ছিল শুরুর পর্বটা। সেইসময় প্লাইমাউথ বন্দরে নৌবাহিনীর কমিশনার ছিলেন কাপ্তান রস। তাঁর সঙ্গে বাইচ খেলার জন্যে তৈরি পালতোলা ছোটোখাটো নৌকো ছিল। সেটা নিয়েই চার্লসদের বিদায় জানাতে কিছুটা পথ গিয়েছিলেন।

ইংলন্ডের প্লাইমাউথ বন্দরের নাম বহুকাল ধরেই সকলের চেনাজানা। ১৮২৪ সালে এই বন্দরের নাম পালটে হয় ডিভনপোর্ট। জানা যায়, প্লাইমাউথ শহরের বেশ কিছু গুহা থেকে পুরোনো পাথুরে যুগের মানুষের হাড়গোড় পাওয়া গেছে। খ্রিস্টের জন্মের কাছাকাছি সময়েও প্লাইমাউথ ছিল বলে অনেকে মনে করেন। সেই সময়কার আলেকজান্দ্রিয়া-র পণ্ডিত মানুষ হলেন টলেমি। তাঁর লেখা *জিয়োগ্রাফিয়া*-য় 'তামারি অস্তিয়া' নামে এক জায়গার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই 'তামারি অস্তিয়া'-ই প্লাইমাউথ-এর আর-এক নাম হতে পারে। শহরটি পুবে প্লাইম আর পশ্চিমে তামার নদীর সঙ্গমে বেড়ে উঠেছে। সতেরো শতকে বাণিজ্যের কারণেই প্লাইমাউথ বন্দরটির বেশ কদর ছিল। পরে ডিভনপোর্ট বন্দর মহাসাগরে রওনা দেওয়া জাহাজগুলিকে মোহনা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া কিংবা তাদের ছোটোখাটো মেরামতির জন্যেই ব্যবহার করা হতো।

বিগ্‌ল্ অপেক্ষা করছিল মহাসাগরের ঢেউ আটকানোর পাঁচিলের বাইরে। প্লাইমাউথ প্রণালীর মাঝামাঝি জায়গায় ঢেউ আটকানোর পাঁচিল। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আসা মহাসাগরের ঝড় প্রায়ই আছড়ে পড়ে। এখনকার মতো সাজানো-গোছানো জাহাজ তখন

ছিল না। ফলে সেই ঝড়ে রীতিমতো নাস্তানাবুদ হতো জাহাজগুলো। তাদের ঝড়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে ওই ঢেউ আটকানোর পাঁচিলের কাছে নোঙর করা হতো। বিগ্‌ল্‌ জাহাজটিকেও প্রথম অভিযান থেকে ফেরার পর ডিভনপোর্ট বন্দরে মেরামাতি করে রওনা দেবার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্লাইমাউথ প্রণালীর পশ্চিমে বার্নপুল থেকে বিগ্‌ল্‌ ইংলন্ড ছেড়েছিল।

দুপুর দুটো নাগাদ চার্লস পৌঁছেছিলেন বিগ্‌ল্‌-এ। তার আগে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরেছিলেন কাপ্তান সুলিভান-এর সঙ্গে। কাপ্তান বার্থোলোমিউ জেমস সুলিভান ছিলেন ব্রিটেনের নৌবাহিনীর আধিকারিক, পেশায় তিনি একজন জলমাপক বলেই সুপরিচিত। গালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে বারতোলোম দ্বীপের নাম দেওয়া হয়েছিল বার্থোলোমিউ সুলিভান-এর নামে। চার্লস ডারউইন-এর বিগ্‌ল্‌ অভিযানে সহ-অভিযাত্রী ছিলেন সুলিভান। তাঁরা দু'জনেই মাংসের চপ আর শ্যাম্পেন দিয়ে দুপুরের খাবার সারলেন। অভিযানের শুরুতে শুভকামনা এবং বিদায় জানানোর জন্যেই খাবারের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিগ্‌ল্‌ আস্তে আস্তে ভাসতে শুরু করল বার্নপুল ছেড়ে। সাগরে হালকা বাতাস বইছিল। সুবিধেই হয়েছিল, ক্রমশ জাহাজের গতিও বাড়ছিল, ঘণ্টায় প্রায় ১৪-১৫ কিলোমিটার বেগে বিগ্‌ল্‌ ভাসছিল। বাড়ির লোকজন, বন্ধু-বান্ধবকে ছেড়ে যেতে মন খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু চার্লস-এর দুপুরবেলার খাবারদাবার এতই ভালো লেগেছিল যে তাঁর মনে হয়েছিল, তাতেই তিনি সবকিছু ভুলে গিয়েছিলেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ডাঙাও চোখের বাইরে চলে যাচ্ছিল। আকাশে ছড়ানো-ছিটানো, টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে, পুব আকাশের মেঘের টুকরো ঘোড়ার লেজের মতো। চিমনির ধোঁয়া আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে, জাহাজও ধীরে ধীরে এগোচ্ছে পশ্চিমে। বিড়ালের পায়ের থাবার মতো ছোটো ছোটো ঢেউগুলি জাহাজের গায়ে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে। মহাসাগরের পুবের বাতাস জাহাজকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কী এক অদ্ভুত অনুভূতি! মহাসাগরের জল আর বাতাসের খেলা, অন্যদিকে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা আর অনিশ্চয়তার অবসান। সকলের চোখে-মুখে এক অনির্বচনীয় প্রশান্তির ছায়া, নতুন পৃথিবীকে দেখার স্বপ্ন। বাতাসের দাপট সামান্য বাড়াতে বিগ্‌ল্‌ বেশ তাড়াতাড়ি গা ভাসিয়ে দিল অতলান্তিকের জলে।

ফিৎজ রয় বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত। মহাসাগরের এরকম এক আবহাওয়ার জন্যেই অপেক্ষা করেছিলেন। চার্লসকে বললেন— "আমাদের সিদ্ধান্ত ঠিকই ছিল।"

চার্লস-এর প্রথম অভিযান, ফিৎজ রয়-এর মহাসাগরের অভিযানের অভিজ্ঞতাকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলেন— "হ্যাঁ, একেবারেই তাই।"

ক্রমশ পুবের হাওয়ার খপ্পর থেকে বেরিয়ে আরো পশ্চিমে এগিয়ে চলল বিগ্‌ল্‌। কিন্তু ফিৎজ রয়-এর মনে হচ্ছিল এত তাড়াতাড়ি পুবের হাওয়া থেকে দূরে না সরলেই ভালো হতো। পুবের হাওয়াও যেন বিগলকে কিছু দূর পৌঁছে দিয়ে নিজেও স্বস্তি পেল। সাগর-মহাসাগরের বাতাসের গতিবিধির ওপর নাবিকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। জাহাজের

ঠিকঠাক চলাফেরা নির্ভর করে এই বাতাসের হালচালের ওপর। এ-সব ফিৎজ বয়-এর ভীষণই চেনা বিষয়। তাই ফিৎজ বাতাসের আনাগোনার ওপর রীতিমতো নজর রাখছিলেন।

নাবিকদের স্বভাবের এক অদ্ভুত দিক আছে। এঁদের ডাঙার আর সাগরের বুকে হাবভাবের মধ্যে বিস্তর ফারাক চোখে পড়ে। এটা না হলে হয়তো দিনের পর দিন, বছরের পর বছর জাহাজের খোলে জীবনকে আটকে রাখতে পারতেন না। কখনো কখনো রূঢ় হলেও সময়মতো শান্ত, সহযোগী হয়ে ওঠেন। দরকারমতো অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ কিংবা অত্যন্ত বিশ্বস্ত থাকেন একে অপরের প্রতি। উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে আচমকা কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলাও করতে হয়। ধূধূ-করা জলমরুপ্রান্তরে কেই-বা থাকে তাঁদের পাশে এসে সঙ্গ দেওয়ার জন্য!

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হলো। জাহাজে মহাসাগরের বুকে প্রথম রাত্তির। চারিদিকে ঘন অন্ধকার, অচেনা, অজানা। শুধুমাত্র জাহাজটুকুই যেন চেনা পৃথিবী। সেখানকার মানুষগুলোও যে সবাই চেনা, তা-ও নয়। সকাল থেকে উত্তেজনা, চিন্তা, আনন্দ— সব মিলিয়ে এক ক্লান্তি ভর করেছিল সারা শরীর জুড়ে। রাত্তির হতে-না-হতেই সেদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন চার্লস।

পরের দিন সকালে অতলান্তিকের আকাশে সূর্যের ছটায় ঘুম ভাঙল চার্লস-এর। বিগ্‌ল্ প্রায় ১৫ কিলোমিটার বেগে বইছে দক্ষিণে। অভিযান শুরু হলেও অভিযানের কাজকর্ম তখনও বিশেষ কিছু ছিল না, কেবলমাত্র কাজের প্রস্তুতি। বেশ কয়েকমাস ধরে লন্ডনে আত্মীয়-পরিজন-বান্ধবহীন অবস্থায় থাকতে থাকতে প্রস্তুতির কাজ অনেকটাই সেরে ফেলেছিলেন। ফলে খানিকটা বিমর্ষ, অলস ভাবনায় আবিষ্ট হয়ে তাঁর সময় কাটছিল। বড়োদিনের নানান ঘটনার ছবি ঘুরেফিরে চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। মনে মনে ভাবছিলেন বড়োদিনের দুর্দমনীয় বেয়াড়াপনার জন্যে কি শাস্তি পাওয়া উচিত? হয়তো মাত্রাছাড়া মদ্যপানের জন্যেই এ-ধরনের অভব্যতা— তাই ক্ষমা করে দেওয়াও যায়। এ-সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা নিয়ে সময় কাটছিল চার্লস-এর। আসলে বড়োদিনের বাড়াবাড়ি তাঁর একেবারেই পছন্দের ছিল না।

হঠাৎ দমকা হাওয়ায় জাহাজ বেশ ছটফট করতে শুরু করল। পুবের সাগরের বাতাসের নাগাল থেকে ছাড়া পেতেই দক্ষিণের ঝোড়ো হাওয়া পৌঁছে গিয়েছিল। ফিৎজ রয় ভাবলেন— আবার সেই ঝোড়ো বাতাস? এই বাতাসের ভয়েই তো রওনা দিতে মাসখানেক দেরি হয়েছিল। উপায় নেই। মহাসাগরের এই পাগলামিকে না মেনে করারই-বা কী আছে! মহাসাগরের এ-ধরনের আচার-আচরণের সঙ্গে তিনি অবশ্য পরিচিত।

এর মধ্যে দিন দুয়েক কেটে গেছে। জাহাজের দুলুনিতে চার্লস-এর শরীরে অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। প্লাইমাউথ তখন প্রায় ৬০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে, মেদেইরা পৌঁছোতে আরো ১২০০ কিলোমিটার যেতে হবে। ক্রমশ অস্বস্তি বাড়ছিল। সাগরের সাধারণ অসুস্থতার মতো ঠিক নয়, গা বমি-বমি ভাব অথচ মাথাঘোরা নেই, দু'চোখ মেলে থাকতেও কোনো

অসুবিধা হচ্ছিল না। সাগরতল বরাবর শুয়ে থাকতে বেশ আরাম লাগছিল। জাহাজে জালের দোলনা টাঙিয়ে শুয়ে শুয়ে সন্ধেবেলায় আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র, চাঁদ দেখে বেশ আনন্দ পাচ্ছিলেন। রাত্তিরের মেঘহীন আকাশের এই অপূর্ব শোভা দেখার সুযোগ তো সচরাচর মেলে না। সুদীর্ঘ অবকাশ, মনোরম আবহাওয়া, চাঁদের আলোয় ভরা আকাশের নীচে জালের দোলনায় শুয়ে চার্লস উপভোগ করছিলেন সন্ধেটা, তাতে অনেকটাই স্বস্তি পাচ্ছিলেন। খাওয়াদাওয়া তেমন বিশেষ ভালো লাগছিল না। বিস্কুট আর কিসমিস ছাড়া কিছু খেলেন না। অন্য কিছু সহ্যও হচ্ছিল না। দুর্বলও বোধ করছিলেন। কিন্তু এ-অবস্থা কাটিয়ে না উঠে উপায়ও ছিল না। তিনি জানতেন মদের সঙ্গে সাবু এবং মশলা মেশানো খাবার খেলে সেরে ওঠা যায়। সেভাবেই খাওয়াদাওয়া করে শুয়েই ছিলেন।

বিগ্‌ল্ ততক্ষণে অতলান্তিকের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে বিস্‌কে উপসাগরে পৌঁছেছে। ফরাসি দেশের পশ্চিম উপকূল বরাবর, স্পেনের উত্তরদিকে এই উপসাগর। নাবিকদের কাছে বিস্‌কে উপসাগরকে বেশ বিপজ্জনক মনে হয়। ফিৎজ রয় আপন মনে ভাবছিলেন— কেন বিস্‌কে উপসাগর এত চঞ্চল? ঢেউয়ের ঘনঘটাই কি প্রতিনিয়ত উচ্ছল? এমনকি অতলান্তিকের মাঝবরাবর, গভীর মহাসাগরের জায়গাগুলোতেও এত উত্তাল ঢেউয়ের আনাগোনা চোখে পড়ে না। অন্যান্য সকলের সঙ্গে এ নিয়ে নানান আলোচনাও করলেন। উত্তরটা অবশ্য ফিৎজ রয় নিজেই খুঁজে পেয়েছিলেন। উত্তর-পূর্ব অতলান্তিকে বিস্‌কে উপসাগর। অগুনতি ঢেউ অতলান্তিক থেকে আছড়ে পড়ে বিস্‌কে উপসাগরে। একটার উপর আর-একটা ঢেউ ধাক্কাধাক্কি করে পাড়গুলোকে বিপর্যস্ত করে। ওই কাঁপুনিতে উত্তাল হয়ে ওঠে বিস্‌কে উপসাগর এলাকা। অবিরামভাবে এই অতি উচ্ছলতা, চঞ্চলতা উপসাগরকে জাহাজের পক্ষে বিপজ্জনক, ভয়ংকর করে তোলে।

যদিও বিগ্‌ল্ কোনো বিপদে পড়ে নি। কোনো ঝোড়ো বাতাস বিস্‌কে উপসাগরে ছিল না। শুধু অশান্ত উপসাগরের দুলুনি খানিকটা সইতে হয়েছিল। বিস্‌কে উপসাগরের তল ভীষণই অসমান, গভীর জলের স্রোতের ধাক্কায় যে-কোনো জাহাজই স্বাভাবিক ছন্দ হারাতে পারে— তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই ধকলটুকুই বিগলকে সইতে হয়েছিল।

চার্লস-এর শরীর মোটেই ঠিকঠাক যাচ্ছিল না। মনে মনে ভাবছিলেন, কী এমন আকুলতা তাকে এ-অভিযানে নিয়ে এসেছিল। এ-সব ভেবে কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। শরীরের হাল ক্রমশ এতটাই খারাপ হচ্ছিল যে, বশিক্ষণ তাঁর পক্ষে ওইভাবে থাকা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। কোনোরকমে টলতে টলতে জাহাজের ডেক-এ এসে দাঁড়ালেন। মহাসাগরের চমৎকার শোভা দেখে যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল মহাদেশের কোনো হ্রদের সঙ্গে কোনো তার তুলনাই চলে না। শুধুমাত্র সুনীল জলই নয়, সাদা ফেনিল ঢেউ আর জলের মেলামেশা যে-কোনো ছবিকেই হার মানায়।

সকালের শরীরের অস্বস্তিভাব খানিকটা সামলে নিয়ে মহাসাগরকে দু'চোখ দিয়ে উপভোগ করেছেন সারা দুপুর। ঢেউগুলো ভাঙছিল জাহাজের গায়ে, ঝাঁকে ঝাঁকে শুশুক

চারপাশ ঘিরে খেলা করছে, সাগরের পাখিগুলো ঢেউয়ের ফেনা দেখে নিদারুণ আনন্দে উড়ছে— এ দেখে যে-কোনো রুগ্‌ণ মানুষই মনে জোর ফিরে পেতে পারে। চার্লস কিছুক্ষণের জন্য খানিকটা সুস্থ হলেও পরে অসুস্থতা আরো বেড়েছিল। পরের দু-তিনদিন এতই বেসামাল হয়ে পড়েছিলেন যে, প্রায় জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা। আবহাওয়াও ধীরে ধীরে পালটে গেল— ভয়ানক খারাপ হলো। এ তো সাগর-মহাসাগরের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। খারাপ আবহাওয়ার প্রভাব চার্লসকে ক্রমশ আরো নিস্তেজ করে দিল।

গভীর মহাসাগরে বিগ্‌ল্ ভাসছে, ওরকম গভীর মহাসাগরে বিগ্‌ল্-এর মতো ছোটো জাহাজকে যথেষ্ট কষ্ট করেই যেতে হয়। এর মধ্যে সময়মাপক যন্ত্র ঠিকমতো কাজ করছিল না। কম্পাসটাও বেশ অসুবিধায় ফেলছে— এ-সব দেখেশুনে ফিৎজ রয় খানিকটা চিন্তায় পড়েছিলেন। তাপমাত্রার কিছুটা হলেও হেরফের হয়েছে— এটা ঠিকই, কিন্তু যদি তার জন্য সময়মাপক যন্ত্র ঠিকঠাক কাজ না করে— তা অবশ্যই দুশ্চিন্তার কারণ। এত বড়ো অভিযানে জায়গা বিশেষে তাপমাত্রার পালটানো তো স্বাভাবিক। তার প্রভাব যদি পড়ে— এই ভেবে ফিৎজ রয় ঘাবড়ে গেছিলেন।

এর সঙ্গে কম্পাসগুলো ভুল দিক দেখাচ্ছিল। তবে এই দিক নির্দেশে সামান্য দু-এক ডিগ্রির এদিক-ওদিক হচ্ছিল। তা কোনোভাবে সামলে নেওয়া গেলেও সময়মাপক যন্ত্রের বিগড়ানোর কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। একসময় ফিৎজ রয় ভেবেছিলেন জাহাজের গতির কারণে হতে পারে। কিন্তু আগের বিগ্‌ল্ অভিযানে এরকম কোনো অভিজ্ঞতা তাঁর হয় নি। এবারের বিগ্‌ল্-এর আদলে কিছুটা রদবদল তো হয়েছেই, ওজনও বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু কোনো নিশ্চিত কারণ না বোঝা পর্যন্ত ফিৎজ-এর দুশ্চিন্তা কাটছিল না। এটাই স্বাভাবিক, অভিযানে সময়মাপক যন্ত্র ঠিক মতো কাজ না করলে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, পর্যবেক্ষণে ভুল হতে পারে। এই অভিযানে এরকম কাজগুলোই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিগ্‌ল্ কিন্তু থামে নি। তাঁদের কাছে যে-মানচিত্র বা অন্যান্য তথ্যাদি ছিল তাতে 'এইট স্টোন্‌স' বা 'আটটি পাথর'-এর একটি জায়গা দেখানো ছিল। সকলেই মানচিত্র অনুযায়ী কাছাকাছি পৌঁছে এইট স্টোন্‌সকে তন্ন তন্ন করে দেখার চেষ্টা করলেন। জাহাজ দাঁড় করানো কিংবা থামানোর কোনো সুযোগ ছিল না। এ নিয়ে চার্লস-এর শুধু নয়, ফিৎজ রয় বা অন্যান্যদেরও বেশ কৌতূহল ছিল। ঝকঝকে সকাল, সূর্যের রোদে চারপাশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ফলে এতগুলো চোখকে উপেক্ষা করা এইট স্টোন্‌স-এর পক্ষে খুব সহজ ছিল না। তাঁদের নজরদারি ছিল বিগল থেকে প্রায় সাত মাইল পর্যন্ত। গভীর কিংবা অগভীর জলের কোথাও কোনো শিলা চোখে পড়ে নি। এর আগেও অনেকে খুঁজেছে কিন্তু এইট স্টোন্‌স-এর কোনো হদিশ পায় নি। চার্লস কোনো কিছু না দেখতে পেয়ে ফিৎজ-কে বললেন— "হয়তো অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের কারণে পাথরগুলোর জন্ম হয়েছিল। তারপর কোনো একসময় তারা হারিয়ে গেছে, আর দেখা যায় না।"

সন্ধে নামল। মহাসাগরের রাত্তিরটা সত্যিই দুর্বিষহ। সঙ্গী-সাথি ছাড়া আর কাউকে

চারপাশে চোখে পড়ে না— এ তো রোজকার ছবি। ঘন কালো পরদার মতো গাঢ় অন্ধকার যেন সবকিছুকে আড়াল করে রাখে— যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত। শুধু মাথার ওপর রুপোলি চুমকি বসানো কালো সামিয়ানাটা কোথাও ছুঁয়েছে পৃথিবীর গায়ে পাতা কালো চাদরটাকে। এ যেমন বিরল, তেমনই বিস্ময়কর দৃশ্য! অবিরামভাবে কানে ভেসে আসে ঢেউদের খেলা করার শব্দ। পালের হাওয়ায় বিগ্‌ল্‌ ভেসে চলেছে তার নিজের মতন।

রাত্তিরেই হালকা রেখার মতো চোখে পড়ছিল উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরের পোরতো সানতো। মাদেইরা দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ হলো পোরতো সানতো, মাদেইরা দ্বীপের মাত্র ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। হালকা মেঘ, রাত্তিরের অন্ধকারে আবছাভাবে চোখে-পড়া পোরতো সানতো যেন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। পোর্তুগিজদের বাস ওই দ্বীপে। এরকমই আর-একটা দ্বীপ হলো দেসারতাস, মাদেইরা দ্বীপপুঞ্জের অন্য আর-এক দ্বীপ। বিগ্‌ল্‌ এগোচ্ছিল পোরতো সানতো আর দেসারতাস-এর মাঝামাঝি ফুংতাল রোড-এ নোঙর করার জন্যে। এর মধ্যে নোঙর ফেলার আর কোনো সুযোগও ছিল না। মেঘলা আকাশ, দমকা হাওয়া বইতে শুরু করল। ঝোড়ো হাওয়ায় বিগ্‌ল্‌-ও ক্রমশ দক্ষিণ-পশ্চিমে যেতে শুরু করল। ফুংতাল রোড একদিকে আর বিগ্‌ল্‌ চলেছে আর-এক দিকে। কোনো উপায় নেই, দমকা হাওয়ার পাগলামির সঙ্গে তাল দিতেই হয়। বিগ্‌ল্‌-ও তেনেরিফে-মুখো হলো।

এ-জায়গায় দক্ষিণ-পশ্চিম ঝোড়ো হাওয়া অনেকসময় বিপদ ঘটায়। ফিৎজ রয় জানতেন, উত্তর অতলান্তিকের জাহাজের এই পথটা বিশেষ সুবিধের নয়। যদিও বেশ কয়েকটা জাহাজের সঙ্গে তিনি কথা বলেছিলেন। তারা অবশ্য অভিযানে বেরোয় নি, ব্যাবসা-বাণিজ্যের কাজে মাদেইরা-র দিকে যাচ্ছিল। ওদের মতে, মাদেইরা নোঙর করার জন্যে বেশ ভালো জায়গা। বিগ্‌ল্‌ তখন মাত্র ওখান থেকে এক কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে। মহাসাগরের হালচাল বুঝে বিগ্‌ল্‌ নোঙর ফেলার নামগন্ধ করল না। পশ্চিমে মাদেইরা-কে ফেলে তেনেরিফে-র দিকেই এগোল। চার্লস তখন আরো অসুস্থ। দূর থেকে মাদেইরা-কে দেখেও উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। সারাদিন এভাবেই কাটল, সন্ধে হতে খানিকটা সুস্থ বোধ করছিলেন। মাদেইরা নিয়ে চার্লস অনেক কথাই জেনেছেন, অথচ সেই মাদেইরা-কে এভাবে দেখা— চার্লস-এর কষ্টই হয়েছিল। এক সময় পোর্তুগিজ নাবিকরাই মাদেইরা-কে প্রথম জেনেছিল, সেদিক থেকে আবিষ্কার বললেও ভুল হবে না। যদিও অনেকের মতে, পোর্তুগিজ নাবিকরা এই দ্বীপপুঞ্জকে পুনরাবিষ্কার করেছিল। আট থেকে এগারো শতকের মধ্যে উত্তর এবং মধ্য ইউরোপে দাপিয়ে বেড়াত স্ক্যানডিনাভিয়া-র কিছু মানুষ— ওরা প্রাচীন স্ক্যানডিনাভিয়া-র ভাষায় কথা বলত। ওই সময়ে ওরা মাদেইরা দ্বীপপুঞ্জের কথা জেনেছিল বলে মনে করা হয়। ১৩৩৯ সালের মানচিত্রে মাদেইরা-কে দেখতে পাওয়া যায়। পনেরো শতকে পোর্তুগাল উপনিবেশ গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিল, সম্ভবত ইউরোপের যে শক্তিশালী দেশগুলি ঔপনিবেশিক কাজকর্ম শুরু করেছিল— পোর্তুগাল তাদের মধ্যে অন্যতম।

পোর্তুগালের নবজাগরণের মূল রসদই ছিল অভিযান এবং আবিষ্কার। সেই সময় অতলান্তিকের বহু দ্বীপ এবং দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে মাদেইরা-র নামও জানা যায়। মাদেইরা-কে পোর্তুগিজ নাবিকরা আবিষ্কার করেছিল না বলে নতুনভাবে চিনেছিল বলাই হয়তো ঠিক হবে। আবিষ্কার বা পুনরাবিষ্কার— যে-কাজই পোর্তুগিজরা করে থাকুক-না-কেন, মাদেইরা নিয়ে চার্লস-এর যে কৌতূহল এবং আগ্রহ ছিল— এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মাদেইরা ভারি চমৎকার দ্বীপ, তার প্রাকৃতিক শোভাও ততোধিক মনোরম। দূর থেকে দেখলে খাড়াই, উঁচু দ্বীপ বলেই মনে হয়, প্রায় হাজার পাঁচেক ফুট উঁচু, সবুজ গাছপালায় ভরা। শ্যামলিমার মধ্যে বরফের মতো সাদা সাদা ছড়ানো-ছিটানো বাড়িগুলো যেন মাদেইরা-কে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। মাঝে-মধ্যে নাবিকরা বেশ বিপদেই পড়ে, কারণ নিচু উপকূল থেকে হঠাৎ খাড়াই ডাঙা, দূরত্ব বুঝতে বেশ অসুবিধে হয়। অবশ্য যদি কারুর ওখানকার ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় থাকে, তার কোনোরকম সমস্যায় পড়ার কথা নয়।

মাদেইরা-র ডাঙা থেকে সাড়ে-পাঁচ কিলোমিটারের কাছাকাছি দূরত্বে যখন বিগ্‌ল্‌, পশ্চিম থেকে ভয়ানক ঝড় উঠল, বিগ্‌ল্ আর-এক বিপত্তির সামনা-সামনি হলো। একবার দমকা হাওয়ার পর খানিকটা শান্ত হলো কিন্তু তাতে কী হবে? মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। ঝোড়ো বাতাস, মুষল বৃষ্টির দাপটে রীতিমতো নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল ফিৎজ রয়-দের।

পরের দিন বিপদ পুরোপুরি কেটে গেছে। সকালে সূর্যের আভায় তুষারে-ঢাকা দ্বীপের চূড়াগুলো যেন জ্বলজ্বল করছিল। হালকা গরম বাতাস বইছিল। আকাশ ঝকঝকে, আবহাওয়াও বেশ চমৎকার। চার্লস-এর শরীর সেদিন অনেকটাই সুস্থ। লম্বা ঢেউয়ের আনাগোনায় মহাসাগর যেন ঢেউ-খেলানো ডাঙার চেহারা নিয়েছে। চার্লস-এর মনে হচ্ছিল— এ-মহাসাগর বোধহয় অতলান্তিক নয়, প্রশান্ত মহাসাগর। এই সুন্দর দৃশ্য প্রশান্ত মহাসাগরেই চোখে পড়ে। দূরে বরফের চাদর-ঢাকা চূড়াগুলোও এর সঙ্গে মিলেমিশে তাদের রূপের পসরা সাজিয়েছে, ফিৎজ রয় বা চার্লসের কাছে পাহাড়ে এ-ছবি অতুলনীয় লাগছিল, তাঁরা ওই রূপের কাছে নিজেদের হারিয়ে ফেলেছিলেন। মহাসাগর এবং তুষার-ঢাকা পাহাড়ের এই মেলামেশা যে-কোনো কাউকেই মোহিত করে দেয়।

তেনেরিফে আর মাত্র বিশ কিলোমিটার দূরে। কাছাকাছি চোখে পড়ছিল সান্তাক্রুজ-এর ছোট্ট শহর। হালকা বাতাস বিগ্‌ল্-কে নিয়ে চলেছে সান্তাক্রুজ-এর দিকেই। একেবারে সমতল, ছোটো ছোটো সাদা বাড়িতে ভরা সান্তাক্রুজ। ধীরে ধীরে ওই সমতলই পাহাড়ের চেহারা পেয়েছে, বেশ উঁচু চূড়ায় গাছপালা রয়েছে। পাহাড়ের নীচে সমতলে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই, চাষবাস তো দূরের কথা। এই উপকূল পাথরে ভরা, মহাসাগরের ছোটো ছোটো ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে পাথরগুলোর গায়ে, অল্পক্ষণের জন্যে, অথচ অবিরাম সাগরের ফেনা মেখে যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করছে ওরা।

সান্তাক্রুজ-এর গির্জাগুলোর মধ্যে একটায় এখনও ব্রিটিশ পতাকা ঝুলছে। ১৭৯৭ সালের

জুলাই মাসের ২২ তারিখে, ব্রিটেনের 'রয়্যাল নেভি' আক্রমণ করেছিল সান্তাক্রুজ-এর বন্দরে। 'সান্তাক্রুজ-এর যুদ্ধ' নামে এই আক্রমণের কথা ইতিহাসে লেখা হয়। তখন স্পেনদেশের মানুষদের দখলদারিতে ছিল ওই বন্দর। ব্রিটেনের 'রয়্যাল নেভি'-র অন্যতম নৌ-সেনাপতি ছিলেন হোরাসিও নেলসন। তাঁর নেতৃত্বেই এই যুদ্ধ হয়েছিল, প্রচুর মানুষের মৃত্যুও ঘটেছিল। শেষ পর্যন্ত হোরাসিও-র ডান হাত ভয়ানকভাবে জখম হয় এবং কেটে বাদও দিতে হয়েছিল। এ-ইতিহাস তো ফিৎজ রয় বা চার্লস ডারউইন-এর অজানা নয়। ফিৎজ রয়-এর মনে পড়েছিল হোরাসিও নেলসন-এর কথা, ভাবলেন যে ওই পতাকা হয়তো নেলসন-ই ফেলে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর ডান হাত বাদ যাওয়ার পর।

চার্লস-এর কাছে সান্তাক্রুজ-এর শহরটাকে ভালোই লেগেছিল। লাল, হলুদ, সাদা রঙের বাড়িগুলোকে ভীষণ চটকদার মনে হচ্ছিল। ছোটো ছোটো জাহাজগুলো নানান বাণিজ্যের পসরা নিয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, কোথাও-বা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অসাধারণ আগ্নেয়শিলার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে-থাকা জাহাজের মাস্তুলগুলোকে অপূর্ব লাগছিল। গির্জাগুলোর আদল প্রাচ্যের দেশগুলোর গির্জার মতন। কিন্তু তাদের মাথায় পতপত করে স্পেন দেশের পতাকা উড়ছে, বেশ মনে হচ্ছিল। চার্লস-এর আরো মনে হলো সান্তাক্রুজ শহরকে অনেকেই বলে কুৎসিত, অসুন্দর— আদৌ তা নয়।

তখনও বাতাস হালকা গরম। আরাম বোধ হচ্ছিল। জাহাজের পেছনের দিকে ছোটো ছোটো ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, মহাসাগরের বাতাস অবিরামভাবে ধাক্কা দিচ্ছে মাস্তুলে। আকাশ এত পরিষ্কার যে তারাগুলোকে ছোটো ছোটো চাঁদের মতো উজ্জ্বল মনে হচ্ছে।

মাত্র এক কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে নোঙর ফেলার জন্য সকলেই তোড়জোড় করছে। আগে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও সুযোগ ঘটে নি। হঠাৎ একটা জাহাজ এসে পৌঁছোল। ছোটোখাটো চেহারার জাহাজটা যে একেবারেই অপরিচিত, তা নয়। ওই জাহাজের লোকজনের বেশভূষাও বেশ চেনা। সান্তাক্রুজ-এর স্বাস্থ্য দপ্তরের জাহাজ। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, তাঁদের বারো দিন পুরোপুরি আলাদাভাবে রাখা হবে। কোথাও বেরোনো বা কোনো মানুষজনের সঙ্গে মিশতে দেওয়া হবে না। শুনে তো সকলেই অবাক— হঠাৎ এরকম সিদ্ধান্তের কারণ কী! এমন এক অদ্ভুত কথা বলা হলো যে, তা কেউ কল্পনাই করতে পারে নি, এমনকি চার্লস বা ফিৎজ রয়-ও না।

উনিশ বা বিশ শতকে কখনো কখনো নানা রোগ মহামারির চেহারা নিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুও ঘটেছে। উনিশ শতকে কলেরা ছিল এরকমই এক ভয়াবহ অসুখ। ওই শতক জুড়ে কলেরা পৃথিবীর মানুষদের বিপর্যস্ত করেছে বারবার। কলেরা প্রথম মহামারির চেহারা নিয়েছিল ১৮১৬-১৮২৬ সালে। শুরু হয়েছিল তখনকার বাংলায়। বহু ভারতীয়, এমনকি ব্রিটিশ সেনাদেরও অনেকে রেহাই পায় নি এর ভয়াবহতা থেকে। পরে কলেরা ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে চীন, ইন্দোনেশিয়া হয়ে ইউরোপে পৌঁছে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়বার শুরু হয়েছিল রাশিয়ায়, তারপর হাঙ্গেরি, জার্মানিতে বীভৎস চেহারা নিয়েছিল ১৮৩১ সালে। ১৮৩২-এ কলেরা-মহামারির কবলে পড়েছিল ইংলন্ড। ব্রিটেনে প্রায় ৫৫ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল, শুধুমাত্র ইংলন্ডেই এই সংখ্যা ছিল সাড়ে ছ'হাজারের কাছাকাছি। ইংলন্ডের মানুষ সেই কলেরাকে বলত 'মহারাজ কলেরা' বা 'কিং কলেরা'।

১৮৩২ সালেই চার্লস-রা পৌঁছেছেন সান্তাক্রুজ-এ। সেখানে তখনও কলেরার নামগন্ধই ছিল না। কিন্তু ইংলন্ডের হালচাল তো অজানা নয়। ফিৎজ রয়-রা ইংলন্ড থেকে এসেছেন। ফলে তাঁদের সঙ্গে কলেরাও যে পৌঁছোতে পারে— এ-ভয় থাকাই স্বাভাবিক। সে-কারণেই সান্তাক্রুজ-এর স্বাস্থ্য দপ্তর তাঁদের মেলামেশার অনুমতি দেয় নি।

আগে থেকে অভিযানের পরিকল্পনায় সান্তাক্রুজ-এ নোঙর ফেলার কথা। শুধু তাই নয়, দিন কয়েক সেখানে থেকে কাজকর্মও করার ভাবনা ছিল। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশ পেতেই সকলে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। চার্লস এতটাই হতাশ হলেন যে, স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশকে বললেন— 'মৃত্যু-বার্তা'। কিন্তু উপায় নেই, প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া কাজ করা উচিত হবে না।

সান্তাক্রুজ-এর অন্যান্য জায়গায় না হলেও, উপকূলের মাপজোক করা জরুরি ছিল। কারণ সেখানকার পর্যবেক্ষণ, কিছু কিছু মাপজোক অভিযানের অনেক ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে রসদ যোগাবে। বিজ্ঞানের কাজকর্ম তো এভাবেই হয়। মাঝখানে ছোটো-খাটো তথ্যের ফাঁক মূল ভাবনার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে। কোনো আলাপ-আলোচনাতেই বিশেষ লাভ হলো না। ঠিক হলো, নোঙর ফেলে সময় নষ্ট না করে কেপ ভার্দ দ্বীপপুঞ্জের উদ্দেশে রওনা দেওয়াই ভালো। হলোও তাই, বিগ্‌ল্ কেপ ভার্দ-মুখো হয়ে ভাসতে শুরু করল।

মাঝ-অতলান্তিক মহাসাগরে যদি বড়োসড়ো দশটা আগ্নেয় দ্বীপমালার নাম করতে হয়, তাহলে কেপ ভার্দ-এর নাম চলেই আসে। পশ্চিম আফ্রিকা-র উপকূল থেকে প্রায় ৫৭০ কিলোমিটার দূরে কেপ ভার্দ দ্বীপমালা। একসময় এই দ্বীপমালা অতলান্তিকের দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে বেশ পরিচিত ছিল। পোর্তুগিজরাই প্রথম খোঁজ পেয়েছিল কেপ ভার্দ-এর। পনেরো শতকে এই দ্বীপমালায় মানুষ বাস করতে শুরু করেছিল।

কিন্তু কেপ ভার্দ-এ পৌঁছোতে অনেক দেরি। থাকার কথা ছিল সান্তাক্রুজ-এ, অথচ অতলান্তিকের বুকেই দুপুর, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে ঘনিয়ে এল। আবার সেই মহাসাগরীয় রাত্তিরের ঘনঘটা। হালকা বাতাস বইছিল। অতলান্তিক ধরে স্পেন দেশে ব্যানারি দ্বীপপুঞ্জের জমজমাট এক দ্বীপ হল গ্রান ব্যানারিয়া। তার পিছন থেকে চারিপাশ আলোর ছটায় ভরিয়ে সূর্য উঠল। ঝকঝকে, উজ্জ্বল সকাল। পশ্চিমে তেনেরিফে টুকরো টুকরো মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল তুষার-মোড়া পাহাড়-চূড়ার আশেপাশে। সূর্যের আলোর ছটায় পাহাড়-চূড়াটাকে মনে হচ্ছিল রুপোর পিরামিডের মতো। বিগ্‌ল্ তখন যেন প্রাণময়। সকলেই বেজায় খুশি। এরকম সুন্দর, মনোরম আবহাওয়ায় সকাল থেকেই সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কোথায় চার্লস-এর অসুস্থতা কিংবা সান্তাক্রুজ-এ কাজ না করতে পারার অনুতাপ—

সবকিছুকেই যেন শুষে নিয়েছে চমৎকার সকালের মিষ্টি রোদ্দুর। কেউ মাছ ধরছে, কেউ-বা মহাসাগরীয় পাখিদের দিকে বন্দুক তাক করে রয়েছে। আচমকাই সবাই কেমন যেন প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। চোখ পড়ল দূরে, বহু দূরে উঁচু এক পাহাড়ের চূড়া। শঙ্কুর মতো মাথাটুকু বেরিয়ে। বাকিটুকু যেন মহাসাগরের জল আড়াল করে রেখেছে।

এর মধ্যে বিগল্ ক্রান্তিরেখা পেরিয়ে এসেছে। আবহাওয়া সুন্দর, ঠিকঠাকই ছিল, শুধুমাত্র একটু বেশি গরম লাগছিল। এটা ক্রান্তি-অঞ্চলের স্বাভাবিকতা, চার্লস তো ইংলন্ডের মানুষ। ফলে ক্রান্তীয় অঞ্চলে যে একটু বেশি গরম লাগবে— এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সে- ধারণা চার্লস-এর ছিলই। শুধু তা-ই নয়, হালকা জামাকাপড় পরে গরম, শুকনো পরিবেশে অন্যরকমই লাগছিল— প্লাইমাউথ-এর ভিজে স্যাঁতসেতে আবহাওয়ার তুলনায়। ক'টা দিন ভালোই কাটছিল। সকালে পরিষ্কার আকাশ, নির্মল রোদ্দুর আর রাত্তিরে অতুলনীয় চাঁদের আলো। বিগল্-এর সকলে হইচই করেই কাটিয়েছে। সবাই ইংলন্ডের মানুষ। ইংলন্ডে ঝলমলে রোদ্দুর যেমন কল্পনাতীত, চাঁদের জ্যোৎস্নাও প্রায় বিরল ঘটনা।

সারাদিন ধরে জাল ফেলে মহাসাগরের নানান জীবকে বন্দি করেছেন চার্লস। সন্ধেবেলায় বেশ ক্লান্ত। সমস্ত দিনের জলবন্দি জীবগুলোকে ভালোভাবে দেখলেন। রীতিমতো অবাকই হলেন— ডাঙার লম্বা-চওড়া, ভারী দেহের জীবের তুলনায় এরা নিতান্তই ছোটোখাটো, চেহারাগুলো যেমন, তেমনই তাদের রঙের বাহার। চার্লস ভাবছিলেন— ছোট্ট একটা শরীরকে সাজানোর জন্য প্রকৃতির এত রঙের প্রয়োজন হয়েছিল!

আবারও আবহাওয়াটা যেন পালটাতে শুরু করল। ঘন কুয়াশার মতো মেঘ ঘিরে ধরল। ঠিক মাথার ওপর ঘন কালো হয়ে জমতে শুরু করেছে। দেখে-শুনে ফিৎজ রয় দুশ্চিন্তায় পড়লেন— এ তো ভালো লক্ষণ নয়। তিনি ধারণা করেছিলেন নিশ্চয় কোনো ভয়ানক ঝড় আছড়ে পড়তে পারে। কিন্তু কালো মেঘের দল অদ্ভুতভাবে ওপরের দিকে সরে গেল। এতেও ভরসা করার মতো কিছু পেলেন না ফিৎজ। তাঁর মহাসাগরীয় অভিযানের অভিজ্ঞতায় মনে হলো মহাসাগরীয় মেঘ ভীষণ কপটতা করে, যে-কোনো সময় ভীষণ রকমের বিপদে ফেলতে পারে। তিনি বিগল্-এর গতি কমিয়ে ফেললেন, কোনো ঝুঁকিই নিলেন না।

ঘন কালো মেঘ, বিদ্যুতের ঝলকানি, মেঘের হাঁকডাক, তারপরেই ঝড় আর মুষলধারে বৃষ্টি— এ তো অতি সাধারণ ঘটনা। মহাসাগরে যারা গেছে, তাদের এরকম অভিজ্ঞতা আছে। এই আবহাওয়া আগে থেকে সাবধান হওয়ার সুযোগ দেয়। কিন্তু হালকা মেঘ বা টুকরো মেঘের আনাগোনা থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই, ওই অবস্থায় ভয়ানক ঝড় হতে পারে। মহাসাগরের অনেক জায়গাতেই এমন ঘটে, সাবধান হওয়ার সুযোগটুকুও দিতে চায় না।

ঘন মেঘের আড়ালে কেপ ভার্দ-কে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছিল না। অথচ খুব যে দূরে, তা-ও নয়। মাত্র পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যেই কেপ ভার্দ। তখন বিগল্ কেপ ভার্দ-এর অনেকটাই পশ্চিমে, স্রোতও পশ্চিম অভিমুখী, প্রায় ঘণ্টায় চার কিলোমিটার। ফিৎজ রয় দেখলেন,

কেপ ভার্দ দ্বীপমালার সেন্ট জাগো দ্বীপ তুলনায় কাছেই, ঠিক উত্তরে।

এখন সেন্ট জাগো বললে বুঝতে অসুবিধে হতেই পারে। উনিশ শতকে এই নামেই দ্বীপটিকে বলা হতো। এখন বলা হয় সানতিয়াগো। এই দ্বীপগুলোয় একসময় পোর্তুগিজদেরই আধিপত্য ছিল। মূলত ভিনদেশীয় দাস ব্যাবসার কেন্দ্র হিসাবে এদেরকে কাজে লাগানো হতো। ১৪৬০ সালে আন্তোনিয় দা নোলি নামে ইতালির এক নাবিক এই দ্বীপের আবিষ্কর্তা।

ভেবে-চিন্তে ফিৎজ ঠিক করলেন, সান্তিয়াগো-র দক্ষিণ উপকূলে প্রায়া বন্দরে নোঙর ফেলবেন। প্রায়া হলো কেপ ভার্দ-এর বড়ো শহর। প্রায়া বন্দর মূলত বাণিজ্যের প্রয়োজনেই কাজে লাগানো হয়।

সাগর থেকে সানতিয়াগো-কে দেখতে নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত, জনমানবহীন বলে মনে হয়, সান্তাক্রুজ-এর তুলনায়। চার্লস-এর মনে হয়েছিল, অতীতের ভয়ানক অগ্ন্যুচ্ছ্বাস, ক্রান্তীয় অঞ্চলের সূর্যের ভয়ানক তাপ হয়তো জমিকে অনুর্বর আর রিক্ত করে রেখেছে। দিগন্ত বরাবর বিস্তৃত উঁচু, পাথুরে পাহাড়ের শেকল। উষ্ণমণ্ডলীয় জায়গাগুলোর সঙ্গে চার্লস-এর বিশেষ পরিচয় ছিল না, সে-কারণে তাঁর কাছে বেশ ভালো লেগেছিল। প্রায়া বন্দরে পৌঁছে সানতিয়াগো-র ডাঙায় ঢুকে তাঁর মনে হয়েছিল— সাগর থেকে আসা কোনো নতুন মানুষ যদি প্রথমবার ডাঙার নারকেল বনের ভিতর দিয়ে হাঁটে, অনেক কিছুই সে খুঁজে নাও পেতে পারে, কিন্তু এক অনির্বচনীয় সুখানুভূতিতে না চাইলেও আবিষ্ট হয়ে থাকবে।

ফিৎজ রয় জানতেন, সানতিয়াগো-তে কয়েকমাস নোঙর ফেলা বেশ নিরাপদ, বিশেষ করে ডিসেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত। এই সময় উত্তর কিংবা পূর্ব দিক থেকে বাতাস বয়। ফলে উপকূল অঞ্চলে ঝড়-ঝঞ্ঝা তেমন হয় না, অথচ জুলাই থেকে অক্টোবর মাস যথেষ্ট বিপজ্জনক। দক্ষিণ থেকে আসা সামুদ্রিক ঝড় উপকূল বা উপসাগরীয় জায়গাগুলোকে বিপর্যস্ত করে দেয়। কিন্তু যখন ভালো আবহাওয়া থাকে, তখনও যে একেবারে শান্ত বাতাস বয়, তা নয়। মাঝে-মধ্যে ভালো আবহাওয়ায় দমকা ঝোড়ো বাতাস ডাঙার ওপর বয়ে যায়। সেজন্যে নোঙর করা জাহাজগুলোকে শক্তভাবে আটকে রাখতে হয়। এমনও হতে পারে অল্প সময়ে নোঙর খুলে দুঃসাহসিকভাবে ভেসে যেতে হলো। ফলে মহাসাগরীয় জায়গাগুলিতে কোনো সময়ই খুব নিশ্চিন্তে থাকা যায় না।

সপ্তাহ তিনেক থাকার কথা প্রায়া-য়। দ্বীপের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানো; পশুপাখি, গাছপালা, শিলা-মনিকের নমুনা সংগ্রহের মতো হাজারো কাজের ভাবনা রয়েছে। ফলে দেশের প্রশাসনের অনুমতি দরকার। বিকেলে ফিৎজ রয়, চার্লস, আরো বেশ কয়েকজন গেলেন সেখানকার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে। রাস্তাঘাট একেবারেই অচেনা, অজানা। খোঁজ-খবর নিয়ে তাঁর বাড়ি চেনা সম্ভব হলো। কিন্তু কোনো দেশের রাজ্যপালের বাড়ি ওরকম হতে পারে— তা বিশ্বাস করতে অসুবিধেই হচ্ছিল। বাড়ির জাঁকজমক না থাকলেও আপ্যায়নে উষ্ণতার কোনো খামতি ছিল না। কথাবার্তা বলতে বা বুঝতে সমস্যা তো হচ্ছিলই। পোর্তুগিজদের দেশে পোর্তুগিজ ভাষারই চল থাকার কথা। চার্লস-রা রাজ্যপালের

ভাষা শুনে বেশ অবাক হয়েছিলেন। তিনি কখনো ইংরেজি, কখনো ফরাসি, কখনো-বা পোর্তুগিজ ভাষায় ও-দেশের নানান গল্প বলছিলেন। বসার ঘরটা ছিল যথেষ্ট বড়োসড়ো, রীতিমতো হাওয়া-বাতাস খেলছে, কিন্তু আসবাবপত্রের ধরনধারণ নিতান্তই সাদামাটা, অগোছালো। ফিৎজ রয় খানিকটা বিস্মিতই হয়েছিলেন— একটা দেশের রাজ্যপালের অতিথিদের জন্য বসার ঘর দেখে।

শহরটা বাইরে থেকে দেখতে ছোট্ট কিন্তু নোংরা গোছের। রাজ্যপালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে শহরের এপাশ-ওপাশ ঘুরে দেখছিলেন। চৌকো, চওড়া রাস্তাঘাট, কালো কিংবা বাদামি চেহারার মানুষদেরই চোখে পড়ল। রাস্তার ওপর ছাগল, শুয়োর নিশ্চিন্তে শুয়ে রয়েছে। সেনাদের চেহারাগুলো কালো, সুঠাম; দেখে মনে হচ্ছিল বেশ বেপরোয়া গোছের— প্রত্যেকের সঙ্গে লাঠি আর বন্দুক রয়েছে।

নানান ফলের পসরা চারিপাশে— কমলালেবু, কলা, আঙুর, পেয়ারা, খেজুর, তেঁতুল। সেদিন কমলালেবু আর কলা খেয়েই চার্লস-রা রাতের খাওয়া সেরে ফেললেন। চার্লস-এর মনে হলো— শুধু ফলই নয়, নানান রঙের ও চেহারার পশুপাখি, ফুল, গাছপালা— বেশির ভাগই অচেনা। বেশ কিছু পাখির ডাক কানে এল— কোনোটাই চেনা বা জানা নয়। পোকামাকড়গুলোও যেন অন্য রকমের।

পরের দিন সকালে পৌঁছোলেন কাছাকাছি কোয়েল দ্বীপে। ভারি চমৎকার! গাছগাছালির চিহ্নমাত্র নেই, কোনো সময়ের অগ্ন্যুচ্ছ্বাসে বেরিয়ে-আসা লাভা ঠান্ডা হয়ে যে-পাথরগুলো তৈরি হয়েছে— তা দিয়েই মোড়া কোয়েল দ্বীপ। চার্লস ভাবলেন, এটাই কোয়েল দ্বীপের সৌন্দর্য। গাছপালাদের ভিড়ে কোয়েল দ্বীপের এই রুক্ষ, শুষ্ক রূপটাই হয়তো হারিয়ে যেত। ভয়ানক গরমে চার্লস-এর কষ্ট হচ্ছিল। দুপুরে বনের তেঁতুল আর কমলালেবু খেয়ে খিদে মেটালেন। সারাদিন ধরে ভূ-বিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে বিভিন্ন নমুনা জোগাড় করেছেন। এরকম গরমের দেশে খাবারদাবারও আলাদা রকমের। রাত্তিরে মিষ্টি আলু আর মাছ খেয়ে বেশ ভালো লেগেছিল চার্লস-এর।

একটা বন্য, মরু দ্বীপে অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি হয়। চার্লস হাঁটছিলেন উপকূলের পশ্চিম দিক বরাবর, সঙ্গে ছিলেন অভিযাত্রী দলেরই স্বেচ্ছাসেবক চার্লস মাস্টার্স্। চারপাশে পোড়া, কালো কতকগুলো পাথরের ঢিবি যেন একে অপরের পিঠে চড়ে রয়েছে— দেখে চার্লস বললেন, "মাস্টার্স্, দেখো শুধু গাছপালা না থাকাই যে মনের মধ্যে নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্বের অনুভূতি তৈরি করে, তা নয়। সবকিছু মিলেমিশে পরিবেশটাই যেন খাঁ-খাঁ করা।"

মাস্টার্স্ নিজেও হয়তো চার্লস-এর কথাগুলো ভাবছিলেন, কিন্তু চুপচাপ একটু হাসলেন। সঙ্গে একজন ডাক্তারবাবুও ছিলেন, পেশায় শল্য চিকিৎসক, রবার্ট ম্যাককরমিক। চার্লস ম্যাককরমিক-কে বললেন— "চলুন আরো কিছু দূর যাওয়া যাক।"

ম্যাককরমিক মাথা নেড়ে বললেন, "অবশ্যই। বেশ ভালোই লাগছে।"

চওড়া খালের পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন চার্লস-রা, খালটা জলে ভরা। কিছুদূর যাবার পর চার্লস বললেন, "আরে এই তো বাওবাব গাছ!"

ম্যাককরমিক খানিকটা হকচকিয়ে গিয়ে অবাক চোখে গাছটা দেখছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না চার্লস এত খুশি কেন গাছটা দেখে। চার্লস নিজেই বলতে শুরু করলেন, "এই গাছেদের আয়ু হাজার বছরের বেশি। অ্যাডানসন-এর মতে, এদের আয়ু ছ'হাজার বছরের বেশিও হতে পারে। এরকমই একটা গাছ রয়েছে লন্ডনের কেনসিংটন প্যালেস গার্ডেন-এ। কিন্তু গাছটার গায়ে লোকজন নাম-ধাম লিখে কিরকম নোংরা করে ফেলেছে।"

মাইকেল অ্যাডানসন হলেন আঠেরো শতকের নাম-করা ফরাসি প্রকৃতিবিদ। ফলে সেইসময় অ্যাডানসন-এর কথা অন্তত প্রকৃতি বিজ্ঞানে আগ্রহী সকলেরই বেশ চেনা-জানা। আর চার্লস-এর তো বটেই। তিনি জানেন যে, উষ্ণমণ্ডলীয় জায়গাগুলোতে এ-গাছ পাওয়াই যায়। কিন্তু তাঁর খেয়াল ছিল না গাছটার কথা। তাই চোখের সামনে গাছটাকে দেখে তাঁর কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল। ম্যাককরমিক ভালোভাবে গাছটাকে দেখে চার্লসকে বললেন, "ভারি চমৎকার তো!"

ম্যাককরমিক গাছটার কথা শুনেছেন কারণ মধ্য-লন্ডনের কেনসিংটন প্যালেস গার্ডেন-এ এই গাছের কথা সবাই জানে। কিন্তু এভাবে দেখে অবাকই হয়েছিলেন। বেশ কয়েকটা ফড়িং দেখলেন; একটা মাছরাঙা পাখি শিকার ধরছিল— এ-সব দেখে চার্লস বললেন, "একটু জিরিয়ে নিই।" তখন গনগনে সূর্য মাথার ওপর। এরকম আবহাওয়ায় তাঁরা কেউ-ই অভ্যস্ত নন। একটা তেঁতুল গাছের নীচে বসে খানিকটা জল খেয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

কিছুদূর যেতেই হাজার দেড়েক ফুট উঁচু একটা ছোট্ট পাহাড় দেখতে পেলেন। অগ্ন্যুচ্ছ্বাসে বেরোনো লাভা জমাট বেঁধেই পাহাড়টা তৈরি হয়েছে— এটা বোঝাই যাচ্ছিল। ম্যাককরমিক জিজ্ঞেস করলেন, "এই অগ্ন্যুচ্ছ্বাসটা কি খুব বেশিদিন আগের?"

চার্লস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "না। দেখে তো বেশিদিন আগের বলে মনে হচ্ছে না।"

হঠাৎ দুটো কালো চেহারার মানুষ দুধ নিয়ে হাজির হলো। চার্লস-রা জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের দুধ?"

"ছাগলের।"

শুনে চার্লস, ম্যাককরমিক হেসে উঠলেন। দুধ খেলেনও। হাতের মুঠোয় অল্প কয়েকটা পয়সা তাদের সামনে ধরতেই ভীষণ খুশি হলো। চার্লস আরো কিছু বেশি টাকা বের করাতে তাদের চোখমুখের ভাব দেখে বললেন, "ম্যাককরমিক দেখো— ওরা কী খুশি! মনে হচ্ছে যেন এবার দুধ গলায় ঢেলে দেবে।"

লোকগুলো হয়তো ওদের ভাষা বোঝে নি। কিন্তু হাসতে হাসতে হইহই করতে করতে চলে গেল। চার্লস তা দেখে অবাক হয়ে ম্যাককরমিক-কে বললেন, "নিগ্রোদের তুলনায় বুদ্ধিমান মানুষ আমি কম দেখেছি। ওদের ছেলেপুলেদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলে ওরা

তোমার পকেট থেকে সবকিছু বের করে খতিয়ে খতিয়ে দেখবে।" এভাবে গল্প করতে করতেই পাহাড়ে চড়ছিলেন। ওই পাহাড়টার নাম 'রেড হিল'। এ-নামেই ওখানকার লোকে চেনে। এর মধ্যে চার্লস, ম্যাককরমিক পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেছেন। ম্যাককরমিক ওখান থেকে চারপাশ দেখে বলে উঠলেন, "কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে চারপাশটা।"

চার্লস-ও বললেন, "সত্যিই, মনে হচ্ছে যেন পৃথিবীর মধ্যে সবথেকে নিঃসঙ্গ, নির্জন দেশে আমরা রয়েছি।"

আসলে চার্লস-এর ভূ-বিদ্যার নানান দিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগ্রহ বেশি। অবশ্য প্রকৃতি বিজ্ঞানী হিসাবে অন্য বিষয়গুলোর প্রতি ঝোঁক কিছুমাত্র কম ছিল না। কিন্তু প্রায়া-য় তাঁর মনে হয়েছিল যে, ভূ-বিদ্যা নিয়ে নানান দিক থেকে ভাবার সুযোগ আছে। এটা তো সব জায়গায় থাকে না। এ-ধরনের আগ্নেয় শিলার ছড়াছড়ি চার্লস-কে সেই সুযোগ করে দিয়েছিল।

এরকম ছোটো-খাটো পাহাড় থাকলেও, প্রায়া-র অনেকটাই জুড়ে রয়েছে সমতল। ম্যাককরমিক-কে সঙ্গে নিয়ে ধূধূ-করা মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। খুব দূরে নয়, একটা টিলার মতো কিছু চোখে পড়ল। চার্লস এ-ক'দিনে বুঝেছেন, ছোটো পাহাড়ে বা টিলাগুলোয় পৌঁছোলে অদ্ভুত সব উপাদান চোখে পড়ে, ধূ ধূ মাঠে নারকেল কিংবা তেঁতুলগাছের হালকা জঙ্গলে একঘেয়েমিও কাটে। ওই টিলার নাম 'ফ্ল্যাগ স্টাফ হিল'। খুব বেশি উঁচুও নয়— মাত্র শ'দুয়েক ফুট। ওখানে বাজপাখি, দাঁড়কাক— এ-সব পাখিদের আনাগোনা। আরো নানান ধরনের পাখি উড়ছে। একটা বুনো বিড়ালকে দেখে ম্যাককরমিক বন্দুকে তাক করছিলেন, গুলিও ছুঁড়লেন। ততক্ষণে বিড়ালটা একটা গর্তে ঢুকে গেল। টিলার চূড়ায় পাথরগুলো এমনভাবে আছে যে, ছোটো ছোটো গুহার মতো তৈরি হয়েছে। বুনো বিড়ালটা যে-গর্তে ঢুকেছে, তার দিকে এগোতেই চার্লস-এর চোখে পড়ল ছাগলের হাড়গোড়। চার্লস বললেন, "ম্যাক! এগুলো দেখে মনে হচ্ছে এই গর্তে বাঘও থাকতে পারে।" ম্যাককরমিক বললেন, "থাকতেই পারে।"

আর বেশি সময় না কাটিয়ে তাঁরা টিলা থেকে নেমে এলেন। কিন্তু আগের দিনের দেখা বাওবাব গাছটার কথা চার্লস ভোলেন নি। রাত্তিরে ফিরে ফিৎজ রয়-কে বাওবাব গাছটার কথা বলেছিলেন। চার্লস এবং ফিৎজ রয় ঠিক করলেন ওই গাছটার মাপজোক নেবেন। সেইমতো লেফটেন্যান্ট জন ক্লেমন্ট্স্ উইকহাম, কাপ্তান ফিৎজ রয় এবং চার্লস ওই গাছটার কাছে পৌঁছোলেন। পকেট থেকে একটা যন্ত্র বের করে হিসেব-নিকেশ করলেন।

ফিৎজ বললেন, "আমি গাছটায় উঠছি। দু'দিক দিয়ে দুটো দড়ি ফেলব।"

উঠে, যথারীতি দুটো দড়ি ফেলে মাপলেন গাছটা কতটা উঁচু। চার্লস পকেট থেকে নোটবই বের করে লিখলেন, ৪৫ ফুট। গাছটার চারপাশ ডিমের মতো, যতটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে সব থেকে বেশি ব্যাস হলো ১৩ ফুট। ফিৎজ রয় গাছ থেকে নেমে তাঁর নোটবই-এ একটা ছবিও আঁকলেন গাছটার। যতটুকু সম্ভব মাপজোক করে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে তাঁরা ফিরে এলেন। ওরকম ধূ ধূ মাঠের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারেরও একটা অতুলনীয় রূপ আছে।

ফেরার সময় চার্লস বেশ উপভোগ করেছেন তা।

সকাল হতে-না-হতেই সুন্দর দেখতে পাল-তোলা জাহাজ এসে হাজির হলো। ফিৎজ রয় ভালো করে দেখে কাছে গেলেন।

"কী খবর?"

"না, কোনো খবর নেই। আফ্রিকার উপকূলে ব্যাবসা-বাণিজ্যের কারণে যাতায়াতের পথেই এখানে আসা।"

ফিৎজ-এর দেখে-শুনে কিছু একটা সন্দেহ হলো। চার্লস বললেন, "মনে হচ্ছে ক্রীতদাসদের চালান করাই এদের কাজ।"

ফিৎজ রয় বললেন, "হতে পারে।"

"মনে হয় জাহাজটা সবকিছু ঠিকঠাক বলছে না। যে-সব জায়গায় জাহাজের সংকেত দেখানো হয়— সে-সব জায়গায় এর যাতায়াত আছে বলে মনে হচ্ছে না।"

যাই হোক, এই নিয়ে ফিৎজ বা চার্লস আর বেশি মাথা ঘামালেন না। কেবল নজর রাখছিলেন জাহাজটার চালচলনের ওপর। কিন্তু সেদিন সময় নষ্ট করার কোনো সুযোগ ছিল না, রাভেইরা গ্রান্ড-এ যাবার কথা। ওখানে যাওয়াটা মুখের কথা না। ছোটো ঘোড়া নিয়ে যেতে হয়। প্রায়া শহরের প্রায় ১৫ কিলোমিটার পশ্চিমে; প্রথম দশ কিলোমিটার বড়ো একঘেয়ে ও বিরক্তিকর। তারপর সেন্ট মার্টিন উপত্যকা— দেখতে হালকা বাদামি রঙের। ছোটো ছোটো নদী বয়ে গেছে। পেঁপে, কলা আর আখগাছে ভরা উপত্যকা। সবুজের ছোঁয়ায় চোখটা যেন তরতাজা হয়ে উঠল। নানান ধরনের রং-বেরং ফুলে ভরা উপত্যকার চারিদিক। দূরে ভাঙাচোরা দুর্গের চেহারা দেখে চার্লস-রা বুঝলেন তাঁরা রাভেইরা গ্রান্ড-এর কাছাকাছি পৌঁছেছেন। আরো কিছুটা যেতেই একটা গির্জা চোখে পড়ল। জায়গাটা আদৌ অন্য জায়গাগুলির মতো নয়, গাছপালায় ভরা। শুধুই নারকেলগাছের বন দেখে অত ভালো লাগে না। কিন্তু যখন কমলালেবুর বনে দু-একটা নারকেলগাছ মাথাচাড়া দিয়ে ওপরে উঠে পড়ে— সে দৃশ্য ভারি চমৎকার। দেখে চার্লস বললেন, "কে বলে যে উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের বনের চেহারা সুন্দর নয়? এত মনোরম ছবি কোথায় আছে?"

সঙ্গে একজন কালো চেহারার পাদরি ছিলেন। তিনি ওখানকার ঘরবাড়ির ইতিহাস বলছিলেন। আর-একজন স্পেন দেশের মানুষও ছিলেন। তিনি একসময় ওই দ্বীপের যুদ্ধে সেনা হিসাবে কাজ করেছেন। পুরোনো গির্জার ঘরবাড়িগুলোই রাভেইরা গ্রান্ড-এর অনেকটা জুড়ে রয়েছে। পাদরি ওই জায়গাটা দেখিয়ে বললেন, "এখানেই দ্বীপের রাজ্যপাল আর সেনা প্রধানদের সমাধি দেওয়া হয়।"

শুনে, চার্লস সমাধি ফলকগুলোকে আরো ভালোভাবে দেখলেন, একটা ফলকের তারিখ ছিল চোদ্দো শতকের। বেশ কিছু অলংকারও চোখে পড়ল, সেগুলো দেখলেই বোঝা যায় একসময়কার ইউরোপীয় বনেদিয়ানার ছাপ রয়েছে।

ওই জায়গাটা অদ্ভুত রকমের চৌকোনো। একদিকে কলাগাছের বাগান, দু'দিকে ঘরবাড়ি

রয়েছে। আর-একদিকে একটা হাসপাতাল। একটা ঘরে সুন্দর সুন্দর আঁকা ছবি রয়েছে। সত্যিই বেশ সুন্দর জায়গা! কিন্তু বেশিক্ষণ সেখানে কাটানোর সময় ছিল না। ফলে ফিরতে হলো তাড়াতাড়ি।

রাত্তিরে জাহাজে ফেরা অনিশ্চিত ছিল, সেজন্যে সঙ্গে খাবারদাবার নিয়েই বেরিয়েছিলেন। অভিযানে বেরোলে শুধু খাবারদাবারই নয়, সব সময়কার দরকারের কিছু কিছু জিনিসপত্তর সঙ্গে থাকেই। মদ আর যবের রুটি খেয়ে রাত্তিরটুকু কাটালেন তাঁরা।

তাঁদের সঙ্গী কালো লোকটি ভীষণই আন্তরিক ছিলেন। ফিৎজ রয়, চার্লস-দের সবকিছুকে বিস্ময়ভরা চোখে লক্ষ করছিলেন তিনি, কিন্তু কখনো বিরক্তি দেখান নি। বরং বেশ হেসে উপভোগ করছিলেন তাঁদের কীর্তিকলাপ।

রাত্তিরে যখন কালো মানুষটি টাট্টু ঘোড়াটাকে বেঁধে রাখলেন, হঠাৎই চার্লস-এর চোখে পড়ল লোকটার হাতে একটা পিস্তল।

চার্লস বললেন— "ওটা কী?"

বন্দুকে গুলি ভরতে ভরতে মানুষটি বললেন— "আমরা যারা নিগ্রো, কালো মানুষ, আমাদের জন্যে এটা ভীষণ দরকার। শুভরাত্রি।"

সকাল হতে-না-হতেই সেই কালো পাদরি সময়মতো পৌঁছে গেলেন।

চার্লস বললেন— "সুপ্রভাত।"

পাদরি এক মুখ হেসে বললেন— "সুপ্রভাত। কেমন কাটল রাত্তিরটা?"

চার্লস তাঁর হাতে অল্পকিছু পয়সাকড়ি দিয়ে বললেন— "দারুণই ভালো।"

এরপর যেখানে বিগল রয়েছে, সেই পোর্ট প্রায়া-র দিকে তাঁরা রওনা দিলেন।

নানান রকমের অদ্ভুত এবং রংবেরঙের জীবদের নমুনা জোগাড় করেছেন চার্লস। ফিৎজ রয়-কে সেগুলো দেখিয়ে বললেন— "কী অদ্ভুত! যত গরমের দেশে যাচ্ছি, তত যেন প্রকৃতির জমকালো চেহারা দেখতে পাচ্ছি। পাখি, মাছ, গাছপালা, খোলক— এগুলো যে খুব অজানা বা অচেনা— এমন নয়। কিন্তু মহাসাগরের জীবরা এদের সকলকে টেক্কা দিতে পারে সৌন্দর্যের দিক দিয়ে। বিশেষ করে স্পঞ্জ আর প্রবালদের বিচিত্র রং, অতুলনীয়!"

ফিৎজ বেশ আনন্দই পাচ্ছিলেন। এই অভিযানে চার্লস-এর মতো কৌতূহলী, প্রকৃতি-প্রেমিক মানুষকেই সঙ্গী হিসাবে চেয়েছিলেন। মনে মনে বুঝলেন, তাঁর পছন্দের কোনো ভুল হয় নি। চার্লস-এর পিঠে আলতোভাবে হাত রেখে বললেন— "সত্যি অসাধারণ!"

পরের দিন সকালে টিপ টিপ দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছিল। তার মধ্যেই কিং-এর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন চার্লস কোয়েল দ্বীপের পশ্চিম উপকূল ধরে। ফিলিপ গিড্লে কিং-এরও বয়স বেশি নয়, ভবিষ্যতে নৌবাহিনীর আধিকারিক হবেন। কিন্তু এবারের অভিযানে নানা কিছু শেখার জন্যেই এসেছেন কিং। ফলে চার্লস-এর সঙ্গেও কিং-কে এই অভিযান শেখার সুযোগ করে দিয়েছে। চার্লস তো যা কিছু দেখেন, সবই সংগ্রহ করেন নমুনা হিসেবে। এত নমুনা যে, চার্লস-এর একসময় নমুনার ঝুলির ভার বইতে বইতে নিজেকে গাধার মতোই

মনে হচ্ছিল— দু'পাশে বস্তা বোঝাই মালপত্তর ঝুলিয়ে চলা এক পরিশ্রান্ত গাধা।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছে নমুনার ঝুলি তত বাড়তেই থাকছে। একদিন চার্লস সারাদিন ধরে নমুনাগুলিকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে রাখলেন। কিছু কিছু নমুনা খালি চোখে ভালোমতো দেখতে পাচ্ছিলেন না। সঙ্গে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিলই— তা দিয়ে কিছু কিছু উপাদানকে চেনার চেষ্টা করলেন।

পরের দিনের সঙ্গী আবার সেই টাট্টু ঘোড়াই। অবশ্য জর্জ রাওলেট, বেঞ্জামিন বাওনে-ও সঙ্গী হয়েছিলেন। বেঞ্জামিন বাওনে ম্যাককরমিকের সহকারী, নিজেও একজন শল্য চিকিৎসক। রাওলেট জাহাজের খাজাঞ্চি। ধূ ধূ করছে মাঠ, কোনো গাছপালা নেই, জনমানবশূন্য। বেশ কয়েক মাইল যাওয়ার পর বাওনে জিজ্ঞেস করলেন, "চার্লস, আমরা ঠিক যাচ্ছি তো?"

"মনে হয় ঠিকই আছে। কম্পাস যা দিকনির্দেশ করছে— তাতে তো ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে।" বলে, চার্লস আর-একবার কম্পাসটা ভালোভাবে দেখলেন।

চারপাশে মাটি এতটাই অনুর্বর যে, কোনো গাছপালাই বেড়ে উঠতে পারে না। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দু-একটা আকাশমণি গাছের মতো এক জাতীয় গাছ চোখে পড়লেও সেগুলোও যেন জীর্ণ— বহুকাল কোনো খাবারদাবার জোটে নি। সে-কারণেই হয়তো বেঁটে-খাটো চেহারার, বেড়ে-ওঠার রসদটুকুও পায় নি। এর মধ্যেই চোখে পড়ল একটা ছোট্ট টিলা, কোনো-এক সময়কার অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের চিহ্ন বলেই মনে হলো। চার্লস বললেন, "দাঁড়াও দাঁড়াও।"

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে, ঘোড়াটাকে টিলার নীচে বেঁধে ধীরে ধীরে টিলার পথ বেয়ে উঠলেন। ভালো করে দেখে-শুনে বললেন, "যা ভেবেছি তাই। এ তো লাভার স্তূপ!" পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মতো কিছু না পেয়ে কম্পাসটা আবার দেখলেন। লাভার স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে যেন অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের নিভে-যাওয়া আগুনের উত্তাপটুকু পেতে চাইছিলেন চার্লস।

কিন্তু কম্পাসের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন, "একি! মনে হচ্ছে রাস্তাটা ভুল হয়েছে। এ তো সেন্ট দোমিনগো-র রাস্তা নয়। সামনে একটা ছোটো গ্রামের মতো মনে হচ্ছে। দেখা যাক, না পৌঁছোলে বোঝা যাবে না।"

চার্লস-রা আবার এগোতে শুরু করলেন। রাস্তায় কয়েকজন কালো শিশুকে দেখলেন। ছেলেমেয়েগুলোর গায়ে কোনো জামাকাপড় নেই, পুরোপুরি উলঙ্গ। ওদের শরীরের অর্ধেকটাই ঢেকে আছে কাঠের আঁটিতে, ওগুলো আগুন জ্বালানোর জন্যেই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিশুগুলোর চোখে-মুখে ভয়ানক ক্লান্তির ছাপ— ওরা ওই গ্রামেই থাকে।

গ্রামটাও ভারি সুন্দর, ছোট্ট নদী গ্রামটার মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। খুব যে রুক্ষতা রয়েছে— এমনটা বলা যাবে না। কিন্তু এ-গ্রাম তো সেন্ট দোমিনগো নয়।

চার্লস একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি সেন্ট দোমিনগো?"

একজন কালো মানুষ, ওখানকারই বাসিন্দা, উত্তর দিল, "না। এটা ফুয়েনতেস।"

ফুয়েনতেস! সেকি? তাহলে সেন্ট দোমিনগো কোন্ দিকে? মানচিত্রটা আবার দেখলেন চার্লস।

ওদের ভাষা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল। কালো মানুষটা জানতে চাইল, "তোমরা কি সেন্ট দোমিনগো যাবে?"

চার্লস ঘাড় নেড়ে বোঝালেন, হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে কালো লোকটা আঙুল দিয়ে একটা সরু রাস্তা দেখালো। চার্লস বুঝলেন ওই দিকেই যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা দিলেন। চার্লস বললেন, "রাস্তা ভুল হয়েছে, এটা ঠিকই। কিন্তু সেটা হয়ে ভালোই হয়েছে।"

বেঞ্জামিন বললেন, "তা না হলে এরকম একটা গ্রাম দেখার সুযোগ হতো না।"

"মানুষগুলোর কত কষ্ট, তাই না! চোখ-মুখ দেখলে বোঝা যায় ওরা বড্ড দুঃস্থ, বিপর্যস্ত।"

"চার্লস, ফুয়েনতেস-এ আসার সময় পাখিগুলোকে দেখলে!"

"কোন পাখিগুলো? মুরগির মতো দেখতে? পশ্চিম আফ্রিকার আদিম পাখিদের চেহারার সঙ্গে মিল রয়েছে মনে হলো।"

"হ্যাঁ।"

"ওদের মাংস খেতে বেশ সুস্বাদু লাগে। তুমি তো খেয়েছ। কিন্তু ওদের মজাটা দেখলে? যে-মাত্র আমাদের দেখছে, সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে পালাচ্ছে?"

"ওরা ভয় পেয়েছে। ঠিক তিতির পাখির মতো, ওগুলোর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করলেই ওভাবে উড়ে পালায়।"

"নাঃ, এবার মনে হচ্ছে ঠিকঠাকই যাচ্ছি। ওটাই দোমিনগো।" এটা বুঝতে পেরে চার্লস বেশ নিশ্চিন্ত হলেন। কাছাকাছি একটা টিলা চোখে পড়ল। অদ্ভুত চেহারা! একদিকটা দেখে মনে হচ্ছে যেন রাজপ্রাসাদের পাঁচিল, অন্য দিকটা পিরামিডের মতো চূড়া। পাহাড়টার কাছে যেতেই দেখা গেল দোমিনগো গ্রামটা, ভীষণ সুন্দর। উপত্যকার কোলে ছোট্ট গ্রাম, চারপাশ লাভার পাহাড়ে ঘেরা। লোকজনে জমজমাট। কালো পাথরের সঙ্গে সবুজ গাছপালার মেলামেশা দোমিনগোকে অপরূপ করে তুলেছে, এর মাঝে সরু নদী বয়ে চলেছে। কলাগাছ, কমলালেবু, নারকেল গাছের বনের এত সৌন্দর্য— চার্লস-কে রীতিমতো অভিভূত করে তুলেছে।

চার্লস বলেই ফেললেন, "কমলালেবু কিংবা নারকেলগাছ নিজের জায়গা না পেলে এই অপরূপ সৌন্দর্য যেন ঠিকমতো দেখাতে পারে না।

একজন ওই গ্রামের লোক এসে চার্লসদের বলল, "আপনারা কোত্থেকে এসেছেন? ইংলন্ড থেকে?"

"হ্যাঁ, আপনি কি এখানকার বাসিন্দা?"

"আমি আসলে পোর্তুগিজ। এখানকার এই বাগানগুলো আমার।"

"চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আপনি একজন ভালো ব্যবসায়ী।"

"আমার বাড়ি যাবেন? বেশি দূরে নয়। যদি মনে হয় রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া করবেন। আমার ভালো লাগবে।"

"হ্যাঁ যেতেই পারি। রাত্তিরে খেতেও অসুবিধে নেই। ধন্যবাদ।"

চার্লস-রা গেলেন। দেখে অবাক হলেন ওই গ্রামের মধ্যেই একটা সাদামাটা বাড়ি অথচ নিজের প্রয়োজনের সবটুকুই ঠিকঠাক করে নিয়েছেন। অল্প সময়ের মধ্যে নানারকম শাকপাতা, টক কমলালেবু, মশলা দিয়ে মাংস রেঁধেছেন। ভীষণই সুন্দর স্বাদের। পোর্তুগিজ লোকটি বললেন, "সামনে সুন্দর এক হ্রদ রয়েছে। দেখলে আপনাদের চোখ জুড়িয়ে যাবে। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর যেতেই পারেন।"

চার্লস জিজ্ঞেস করলেন, "কতদূর?"

"বেশি না, মাইল দুয়েক হবে।"

রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে হ্রদের দিকে রওনা দিলেন। একটা ছোটো নদীর গা ঘেঁষে রাস্তাটা পৌঁছেছে হ্রদে। চারদিকে জঙ্গল— শুধু ফলের গাছ আর নানান ধরনের বুনো রং-বেরঙের ফুল। কী গাছ নেই— কলা, আখ, কফি, পেয়ারা, নারকেল! হ্রদটা সত্যিই মনোরম। ওখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে প্রায়া-য় পৌঁছোনোর রাস্তা ধরে ফিরছিলেন। হঠাৎ মাঝ রাস্তায় একদল অল্পবয়সি মেয়েকে দেখলেন, জনা বিশেক হবে।

অদ্ভুত ধরনের পোশাক পরেছিল তারা, কালো চেহারায় বেশ সুন্দর লাগছিল। গায়ে বড়ো চওড়া শাল, তার নীচে পাতলা সাদা হালকা কাপড়ের জামা, মাথায় হালকা খয়েরি রঙের পাগড়ির মতো বাঁধা। কাছাকাছি পৌঁছোতেই ওরা পিছন ফিরে রাস্তা আটকে গান গাইতে শুরু করল। গলা ছেড়ে বুনো সুরে গান গাইছিল, দু'হাত দিয়ে সজোরে পায়ের ওপর তাল দিতে দিতে।

কিন্তু রাত বাড়ছে, বেশিক্ষণ দাঁড়াবার সময় ছিল না। চার্লস-রা তাদের দিকে ওদের দেশের কিছু পয়সা ছুঁড়ে দিলেন। মেয়েগুলো বেশ আনন্দে সেগুলো নিল, ভয়ানক জোরে সকলে মিলে হেসে উঠল। বোঝা গেল যে তারা খুবই খুশি হয়েছে।

চার্লস কিছুদূর যাওয়ার পর জর্জ আর বেঞ্জামিন-কে জিজ্ঞেস করলেন, "এবার ঠিক রাস্তায় ফিরছি তো?"

জর্জ, বেঞ্জামিন ভালোই জানতেন, রাস্তাঘাট চেনার ব্যাপারে চার্লস অত্যন্ত পটু, বললেন, "মনে তো হচ্ছে ঠিকই আছে।"

মাঝে দু-একবার এদিক-ওদিক হলেও শেষমেশ প্রায়া-য় পৌঁছোলেন। তখনও ভোর হয় নি। ঘোড়াগুলোও ক্লান্ত, সারা দিনরাত তারা চার্লসদের সঙ্গে ছুটেছে।

ওখানে সন্ধে ছ'টা বাজতে-না-বাজতেই সূর্য ডুবে যায়। ইংলন্ডেও এরকমই হয়।

চার্লস ভাবলেন, সূর্যের তো অস্ত যাবার কথা সন্ধে আটটা নাগাদ। প্রায়া-র পুব দিকে মাস্টার্স্-এর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ওই আগের দেখা একদল পাখি চোখে পড়ল, অদ্ভুতভাবে তাদের সঙ্গে একটা বুনো বেড়ালকে দেখে চার্লস বললেন, "মাস্টার্স্, দেখো, শিকারি কখনো কখনো বন্ধুও হতে পারে।"

ফিৎজ রয় ব্যস্ত ওখানকার চুম্বকত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা নিয়ে। কিন্তু চার্লস-এর কাছে

ডাঙার পশুপাখির তুলনায় মহাসাগরের প্রাণীদের সংগ্রহ করার ঝোঁক বেশি। প্রায়া ছেড়ে বিগ্‌ল্-এরও রওনা দেওয়ার সময় হয়ে গেছে। তখনও চার্লস তোড়জোড় করছেন ওখান থেকে আরো কিছু প্রবাল জোগাড় করার। সারাদিন ধরে অনেক চেষ্টা করেও বিশেষ তেমন প্রবাল পেলেন না। তাতে যে তাঁর খুব আক্ষেপ ছিল তাও নয়, প্রায় সপ্তাহ তিনেক প্রায়া-য় তিনি যা দেখেছেন আর পেয়েছেন— তাতেই ভয়ানক খুশি।

যে-দিন প্রায়া থেকে বিগ্‌ল্-এর ফেরার কথা ছিল, সেদিন হলো না, ফিৎজ রয় এতটাই বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন যে, দিন দুয়েক পিছোতে হলো। বিগ্‌ল্ ছাড়ার পর সুযোগ পেয়েই চার্লস বাবাকে লিখলেন:

বাহিয়া, সান সালভাদোর, ব্রাজিল

প্রিয় বাবা, ফেব্রুয়ারি ৮, ১৮৩২

আমি লিখছি ফেব্রুয়ারি মাসের আট তারিখে। একদিন আগেই সেন্ট জাগো (কেপ দে ভার্দ) ছেড়ে এসেছি। মনে হচ্ছে, বিষুবরেখার কাছাকাছি কোথাও হয়তো ঘর-ফেরতা কোনো জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। যাই হোক, সময়ই একমাত্র বলতে পারে কখন সেই সুযোগ আসবে! ইংলন্ড ছেড়ে যখন এসেছি, তখন থেকে এ-যাবৎ যা যা ঘটেছে, তা ছোটো করেই বলব। তুমি তো জানই ডিসেম্বর মাসের ২৭ তারিখে আমাদের জাহাজ ছেড়েছে। এখনও পর্যন্ত মোটামুটিভাবে মাঝারি গোছের বাতাসের মুখোমুখি হয়েছি। চ্যানেল, মাদেইরা এবং আফ্রিকার উপকূলে বড়োসড়ো ঝড় থেকে বেঁচে গেছি। তবে ঝড়ের মধ্যে না পড়লেও সাগরের অশান্ত চেহারা— তা টের পেয়েছি। বিস্‌কে উপসাগরে অবিরাম বড়ো ঢেউ-এর দাপট ছিল। আমার সামুদ্রিক অসুস্থতায় বেশ কষ্ট হয়েছে, এতটা বাড়াবাড়ির কথা আমি আগে কখনো ভাবতে পারি নি। আমার মনে হয়, তুমি এটাই জানার জন্য কৌতূহলী ছিলে। তোমাকে আমার ভালো-লাগার অভিজ্ঞতাগুলোও বলব। কেউ যদি ২৪ ঘণ্টা সাগরে না থাকে, তাহলে বলতে পারবে না যে সামুদ্রিক অসুস্থতা কতটা কষ্টকর। যখন তুমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখনই আসল কষ্টের শুরু, সামান্য পরিশ্রমেই মনে হয় যেন জ্ঞান হারিয়ে যাবে। আমার মনে হয়েছে, একমাত্র জালের দোলনা-বিছানাই তখন ভালো লাগে। বিশেষ করে তোমার দেওয়া কিসমিস ছাড়া আর কোনো খাবারই পেটে সয় নি।

জানুয়ারি মাসের চার তারিখে আমরা মাদেইরা-র খুব কাছাকাছি ছিলাম, মাত্র মাইল খানেক দূরত্বে। তখন সেখানকার সমুদ্র উত্তাল, ডাঙার দিকে বাতাস বইছিল। কিন্তু এর সঙ্গে তাল মেলানো ঠিক হবে না বলেই মনে হয়েছিল। সত্যিই আমরা ঝঞ্ঝার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম কারণ পরে বাতাস ডাঙার উলটো দিকে ঘুরে গিয়েছিল। সেইসময় আমি এতই অসুস্থ ছিলাম যে উঠে দাঁড়িয়ে দেখব, সে ক্ষমতাও ছিল না। ছ'তারিখ সন্ধেবেলায় আমরা সান্তাক্রুজ-এর উপসাগরে পৌঁছেছিলাম, তখনই প্রথম মোটামুটি সুস্থ বোধ করলাম। মনোরম উপত্যকার ফলের বাহার যেন ছবির মতো লাগছিল; হামবোল্‌ড্‌ট-এর লেখায় এর চমৎকার বিবরণ পেয়েছিলাম। যখন একজন লোক এসে খবর দিল বারোটা দিন বন্দি দশায় থাকতে

হবে আমাদের— আশা করি তুমি আমাদের নৈরাশ্য কল্পনা করতে পারছ। জাহাজে সেইসময় যেন মৃত্যুর নীরবতা বিরাজ করছিল, তারপর একসময় কাপ্তান পাল তোলার নির্দেশ দিলেন। ওই জায়গার জন্য যে সুতীব্র আকর্ষণ, তা পুরোপুরিভাবেই বিনষ্ট হলো।

তেনেরিফে আর গ্রান্ড কানারির মধ্যে একটা দিন যেন চুপচাপ কাটল, এখানেই আমি প্রথম আনন্দ উপভোগ করলাম। মেঘে ঢাকা তেনেরিফে-র চূড়াটা যেন মনে হচ্ছিল এক অন্য পৃথিবী। এই সুন্দর দ্বীপকে দেখার ভয়ানক বাসনা— সেটাই ছিল আমাদের একমাত্র সমস্যা। আইটন-কে বোলো যেন সে কখনো কানারি দ্বীপমালা কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার কথা না ভোলে। আমি নিশ্চিত যে তাকে সমস্যায় পড়তে হতে পারে, কিন্তু সেজন্যে যেন মনের দিক থেকে তৈরি থাকে। আমি এটাও জানি, যদি এই প্রচেষ্টা ও না করে পরে অনুতাপ করবে। তেনেরিফে থেকে সেন্ট জাগো বেশ ভালো কেটেছে। আমার সঙ্গে থাকা জাল দিয়ে জাহাজ থেকেই প্রচুর অদ্ভুত ধরনের প্রাণীদের ধরেছি, কেবিনের মধ্যেই সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। আবহাওয়াও এত ভালো ছিল যে, আকাশ এবং জল মিলেমিশে একাকার, অসাধারণ ছবির মতো। ১৬ তারিখে কেপ দে ভার্দ-এর রাজধানী প্রায়া-য় পৌঁছোলাম। সেখানে প্রায় ২৩ দিন ছিলাম, গতকাল অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির সাত তারিখ পর্যন্ত। সময়টা ভীষণ আনন্দে কেটেছে। সত্যি কথা বলতে এর থেকে আনন্দের কিছু হতে পারে না। অসম্ভব ব্যস্ততা ছিল। একদিকে কাজ, অন্যদিকে আনন্দের এক অপূর্ব অনুভূতি। আমার মনে হয় না, তেনেরিফে ছাড়ার পর আধঘণ্টাও আমি অলসভাবে কাটিয়েছি। সেন্ট জাগো আমাকে প্রকৃতির ইতিহাসের প্রচুর রসদ জুগিয়েছে। আমি দেখলাম, উষ্ণমণ্ডলীয় জীবদের বিবরণগুলো যথেষ্ট মূল্যবান, অবশ্যই আমি পরোক্ষভাবে ছোটো-খাটো জীবদের কথাই বলছি।

একটা আগ্নেয়গিরির দেশে ভূ-বিদ্যার কাজ ভীষণই ভালো-লাগার। এর জন্যে কোনো আগ্রহ না থাকলেও, তা যেন এক সুন্দর অথচ নিরিবিলি জায়গায় পৌঁছে দেয়। প্রকৃতির ইতিহাসকে পছন্দ করে এমন মানুষ না হলে কলা আর কফি গাছের বনে, নারকেল গাছের নীচে, অসংখ্য বুনো ফুলের মধ্যে ঘোরার আনন্দই উপভোগ করতে পারবে না। এই দ্বীপ থেকে আমরা যা আনন্দ এবং শিক্ষা পেলাম, তাতে করে বুঝলাম ভীষণ অপছন্দের জায়গায়ও আমাদের যেতে হবে। সাধারণভাবে এটা হলো এক খাঁখাঁ-করা মরু প্রান্তরের মতো, অথচ উপত্যকাগুলো বড়োই সুন্দর। প্রাকৃতিক শোভা নিয়ে কিছু বলার নেই, এটা অনেকটা অন্ধ মানুষকে রং নিয়ে ব্যাখ্যা করার মতো। যে কখনো ইউরোপের গণ্ডি ছেড়ে বেরোতে পারে নি, সে উষ্ণমণ্ডলের শোভা ভাবতে পারবে না। যখনই আমি কোনো কিছুকে উপভোগ করি, আমার নোটবইতে (যা ক্রমাগত বাড়ছেই) কিংবা চিঠিতে লিখে ফেলি। সে-কারণে এই আনন্দে আত্মহারা ভাবটা কিংবা তা যদি অন্যভাবে বলে ফেলি— তুমি তা ক্ষমা করবে। দেখছি, আমার সংগ্রহ নিদারুণভাবে বাড়ছে, মনে হয় রিও থেকে কিছু মালপত্তর বাড়িতে পাঠাতে হবে।

প্লাইমাউথ-এ অনন্ত বিলম্ব একদিক থেকে ভালোই হয়েছে, কারণ আমার মনে হচ্ছে যে

প্রকৃতির ইতিহাসের নানান দিককে বোঝা এবং তার নমুনা সংগ্রহে এত ভালো ব্যবস্থাপনা কম জনই পায়। বিভিন্ন দিক থেকে ভেবে আমার নিশ্চিতভাবে ভালো মনে হয়েছে। ভেবে বিস্মিত হই, একটা জাহাজ কত কাজের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। সবকিছুই হাতের কাছে, যে-কোনো কারুর নিয়মরীতি না মেনে উপায়ও নেই, শেষমেশ লাভই হয়েছে আমার। বাড়ির কাছাকাছি কোথাও গিয়ে আবার ফিরে আসার মতো আমার সাগরে যাওয়া। ছোটো করে বলা যায় জাহাজটা হলো বাড়ির মতোই মনোরম, যা দরকার তাই পাই। যদি সামুদ্রিক অসুস্থতার দিকটা না থাকত, তাহলে পৃথিবীর সকলেই হয়তো নাবিক হতো। আমার মনে হয় না যে, এরাসমাস-এর উদাহরণ দেওয়া এখানে ভুল হবে, তিনি এর ওপর ভরসা করতে পারতেন, যদি সামুদ্রিক অসুস্থতার দশভাগের একভাগও জানতেন।

আমি জাহাজের আধিকারিকদের আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি পছন্দ করি। বিশেষ করে উইকহাম, অল্পবয়সি কিং, স্টোক্‌স, বাকি আর সকলকেই। কাপ্তান খুবই দয়ালু। আমাকে তাঁর সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য করেন। উপসাগরে থাকার সময় আমরা একে অপরকে কতটুকুই-বা দেখার সুযোগ পাই! আমাদের কাজের ধরন সে-সুযোগ দেয় না। আমি জীবনে কখনো অন্যের পরিশ্রমকে ভাগ করে নিতে পারে— এরকম লোক দেখি নি। তিনি বিরামহীনভাবে কাজ করে যান, যখন আপাতভাবে কোনো কিছু করেন না, ভাবেন। যদি তিনি আত্মহনন করে না বসেন তবে অভিযানে অভূতপূর্ব কাজ করতে পারেন। আমি খুবই ভালো আছি। এখনও পর্যন্ত অন্যদের মতো সামান্য উত্তাপ সহ্য করতে পারছি। খুব তাড়াতাড়ি এর আসল রূপ দেখতে পাব। ব্রাজিলের উপকূল থেকে দূরে ফারনান্‌দো নোরোন্‌হা-র দিকে এগোচ্ছি। ওখানে বেশিদিন থাকব না, বাহিয়া-কে ছুঁয়ে রিও এবং ফারনান্‌দো নোরোন্‌হা-র মাঝে অগভীর জায়গাগুলোতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাব। যখন পাঠাবার মতো সুযোগ পাব, তখনই এই চিঠির লেখা শেষ করব।

চিঠিটা শেষ না করেই রেখে দিলেন চার্লস। তাঁর শরীরটা আবার বেশ অসুবিধায় ফেলল। কোনো সামুদ্রিক ঝড় বা আবহাওয়া খারাপ হওয়ার জন্যে নয়। আবহাওয়া ভালো ছিল, সমুদ্রও শান্ত, কিন্তু চার্লস-এর গা বমি-বমি ভাব আর তা থেকে বেশ অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। খানিকটা অবসন্ন হয়ে নিজের প্রতিই বিরক্তি বোধ করছিলেন।

পরের দিন সকালে একটা জাহাজকে দেখে সকলেই নজরদারি শুরু করলেন। সারাদিন ধরে সবার চোখ ওই জাহাজটার দিকেই। সন্ধেবেলায় তার কাছাকাছি পৌঁছোলেন চার্লস-রা। চার্লস বললেন, "বেশ চেনা চেনা লাগছে।"

"মনে হচ্ছে ইংলন্ডেরই ডাক-জাহাজ।" বলে ফিৎজ রয় আরো কাছে গেলেন।

"আরে, এই তো 'লাইরা'। আমাদের জন্যে একটা বাক্স আনার কথা।"

শুনে চার্লস খানিকটা আশ্বস্ত হলেন, কারণ বাড়ির সঙ্গে অনেকদিন কোনোরকম যোগাযোগ নেই, ফলে চিঠিপত্তর পাঠানো যেতে পারে। চার্লস জানতেন, লাইরা ইংলন্ড থেকে রিও-দে-জেনেইরো যাবে। কিন্তু ফিৎজ রয়-এর বেশি আগ্রহ ওই বাক্সটা নিয়ে।

"আচ্ছা, একটা বাক্স এসেছে কি আমাদের জন্যে?" ফিৎজ রয় জিজ্ঞেস করলেন 'লাইরা'-র নাবিকদের।

"হ্যাঁ।"

"চমৎকার! ওটা আমাদের ভীষণ দরকার।"

ফিৎজ রয় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বাক্সটা পাওয়ার জন্যে। আসলে বাক্সটার মধ্যে সমুদ্রের গভীরতা মাপার একটা যন্ত্র আছে। তার নাম হলো 'ম্যাসে'-র যন্ত্র। একসময় নাবিকরা নানা উপায়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপত, কিন্তু সেই যন্ত্র দিয়ে ১৮০ মিটারের বেশি মাপা সম্ভব হতো না। ইংলন্ডের স্ট্যাফোর্ডশায়ার-এর এডওয়ার্ড ম্যাসে যন্ত্রটার নতুন সংস্করণ করেছিলেন। এডওয়ার্ড ম্যাসে-র পারিবারিক পেশা ছিল ঘড়ি তৈরির, কিন্তু পরে সেই পরিচিতি পালটে হয় সাগরের যন্ত্রপাতি তৈরির, ম্যাসে নিজের ওই পরিচয় দিতে পছন্দ করতেন। যাই হোক ফিৎজ রয় ওই যন্ত্রটা 'লাইরা'-র মাধ্যমে পাঠাবার জন্য বলেছিলেন।

'লাইরা'-র নাবিকরা বিগ্‌ল্-এর সকলের সঙ্গে মেলামেশা করে খুশিই হলেন। চার্লস-রাও বেশ কিছুদিন পরে নিজের দেশের লোকজনদের পেয়ে ভালোই কাটালেন। যদিও 'লাইরা'-র নাবিকেরা চলে যাওয়ার পর চার্লস-এর অনুতাপ হয়েছিল। আসলে সেইসময় ইংলন্ড কলেরায় বিপর্যস্ত। এ নিয়ে কোনো কথা 'লাইরা'-র নাবিকরা বলেন নি, বিগ্‌ল্-এর কেউ জিজ্ঞেসও করেন নি।

বিগ্‌ল্ অনেকটাই দূরে চলে গেছে 'লাইরা'-কে ছেড়ে। ছোটো ছোটো ঢেউ খেলা করছে বিগ্‌ল্-এর চারপাশে, উড়ুক্কু মাছগুলোও যেন বেশ মজা পেয়েছে— মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে। বেশ কয়েকদিন সকলের অলসভাবেই জাহাজে দিন কাটছে। ধীরে ধীরে ক্রান্তীয় অঞ্চলের উত্তাপ জানান দিচ্ছে। অথচ সন্ধের পরে ঠান্ডা ঠান্ডা ভাবটা সকলের বেশ ভালোই লাগছে। কিন্তু বিছানায় শুলে এক অস্বস্তিকর অনুভূতি হচ্ছিল। চার্লস-এর মতে, এই অনুভূতি অনেকটাই গলা মাখনের ভাপে সিদ্ধ হওয়ার মতোই। তাঁর পেটের সমস্যা কাহিল করে দিয়েছিল।

বিষুবরেখার থেকে মাত্র ১৫০ কিলোমিটারের কাছাকাছি দুরত্বে তখন বিগ্‌ল্। দুপুরবেলা, হালকা বাতাস কিন্তু মাঝেমধ্যে ঝোড়ো দাপটও ছিল, কখনো-সখনো অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়ছিল। নানান চেহারার মেঘে আকাশ ঢেকে যাচ্ছে। সেই মেঘের ছায়ায় মহাসাগরের জলকে বেশ কালচে লাগছিল। দিগন্তে ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, মনে হচ্ছে কেউ যেন তুলি দিয়ে লাল রঙের আলতো টান দিয়েছে অথচ তার ওপরের আকাশটা হালকা হলুদ রঙে ভরা। এ-সময় বিগ্‌ল্ ডাঙা থেকে অনেক দূরে মহাসাগরে ভাসছে। অথচ ফিৎজ রয় নিশ্চিন্ত, কোনো মেঘই বিপদ ঘটানোর মতো নয়।

এর মধ্যে অন্য আর-এক আশঙ্কায় সকলে খানিকটা জড়সড়। এ-সব জায়গায় নাকি নেপচুনের দেখা পাওয়া যায়। আগেও কয়েকটা জায়গায় এই ভয় তাঁরা পেয়েছিলেন। এই নেপচুন গ্রহ নয়, রোম দেশের পৌরাণিক কাহিনিতে সাগরের দেবতা হিসাবে নেপচুনকে

ভাবা হতো। গ্রিস দেশে এই দেবতার নাম ছিল পসিদন। নেপচুনের বা সাগর দেবতার পাহারাদারকে নাবিকরা রীতিমতো ভয় পেতেন।

রাত্তিরেই সেন্ট পলস দ্বীপের পাথরগুলো চোখে পড়ছিল। পাথরগুলোর অবস্থান ছিল ০০° ৫৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ২৯° ১৫′ দ্রাঘিমাংশ। আরো সহজভাবে বললে আমেরিকা থেকে প্রায় ৮৭০ কিলোমিটার দূরে। বিগ্‌ল্ তখন এগোচ্ছিল ফারনান্‌দো নোরোন্‌হা-র দিকে। সেখান থেকে ওই জায়গা প্রায় সাড়ে পাঁচশো কিলোমিটার আগে। সকাল হতেই তাঁরা দেখলেন ওই শিলাগুলো বেশ কাছাকাছি। যখন মাত্র পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে, দুটো ছোটো নৌকো করে স্টোক্‌স্ আর উইকহাম সাগরে নেমে পড়লেন। জন ক্লেমেন্ট্‌স্ উইকহাম হলেন এই অভিযানের লেফটেন্যান্ট। তিনি এবং চার্লস দু'জনে মিলে পাথরগুলোর ভূ-বিদ্যার দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য একটা নৌকো নিলেন। জন লর্ট্ স্টোক্‌স্ হলেন সহকারী সমীক্ষক। ফলে সমীক্ষার কাজের দায়িত্ব তাঁরই। তিনি অন্য আর-একটা নৌকো নিয়ে পাথরগুলোর দিকে এগোলেন।

শিলাগুলো যে সাগরের ওপরে খুব বেশি মাথা তুলে রয়েছে, এমনও নয়। সাগরতলের ওপরে খুব বেশি হলে ৪০ ফুট দেখা যাচ্ছে। মাত্র কিলোমিটার খানেক জায়গা দখল করে রেখেছে। বিস্তীর্ণ সাগর তলে অতটুকু দখলদারি, নেহাতই বিনম্রতা ছাড়া কীই-বা বলা যেতে পারে! কিন্তু তাতে কী হবে! তর্জন-গর্জনের কোনো খামতি ছিল না। সারিবাঁধা লম্বা লম্বা ঢেউগুলো আছড়ে পড়ছে শিলার গায়ে। চার্লস শিলাগুলোর কাছাকাছি গিয়ে বললেন—

"এ তো ভয়ানক, পাথরগুলোকে দেখব কিভাবে?"

"সময় লাগবে। ধীরে ধীরে পৌঁছোতে হবে।" উইকহাম নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট। ফলে নিজের ওপর আস্থার কোনো অভাব ছিল না।

"পাথরগুলোর এরকম অদ্ভুত রং কেন? মুক্তোর মতো ঝকঝক করছে।"

চার্লস কাছে যাবার জন্য যত ছটফট করছেন, তত ঢেউ তাকে পিছনে ফিরিয়ে দিচ্ছে।

"দেখেছো পাখিগুলোর অবস্থা!" বলে উইকহাম বেশ বিরক্ত হলেন।

"একি!" চার্লস রীতিমতো অবাক হলেন।

চারিদিকে পাখির দল উইকহাম আর চার্লস-কে ঘিরে ধরেছে। মনে হচ্ছে যেন ওদের রাজ্যে কোনো শত্রু আক্রমণ করেছে। চার্লস বললেন— "এত পাখির বিষ্ঠাই পাথরগুলোর আসল রংটা পালটে দিয়েছে।"

কিন্তু পাখিদের অনবরত আক্রমণাত্মক চেহারা দেখে পাথর ছুঁড়তে শুরু করলেন। দুটো নৌকোই তখন পাথরগুলোর কাছে পৌঁছে গেছে। অবিরাম পাথর ছোঁড়াতে দু-চারটে পাখি ঘায়েল হলো। কিন্তু তাতে পাখিগুলো আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

ওই রাজ্যটা পাখিদের নিজেদের। ওরা ওখানকার কিছু পশুপাখিদেরই চেনে। কিন্তু কোনো মানুষের তো সচরাচর যাওয়া-আসা নেই, ফলে নেই-মানুষের দেশে যে-কোনো মানুষই আগন্তুক। কী এক অদ্ভুত দৃশ্য! পুরো আকাশটা ছেয়ে রয়েছে পাখিতে, তারা তারস্বরে

নিজেদের ক্ষিপ্ততাকে প্রকাশ করছে।

চার্লস-দের মধ্যে একজন বললেন— "হাতুড়িটা দাও তো।"

"কী করবে?" চার্লস জিজ্ঞেস করলেন।

"এখন হাতুড়িই তো মিসাইলের কাজ করবে।"

"না। একেবারেই না। হাতুড়ির হাতল ভেঙে গেলে কাজ করতে পারব না।"

"কিন্তু উপায় কী?"

শেষমেশ দু-একবার হাতুড়ি ছোঁড়া হলো, আরো কয়েকটা পাখি ঘায়েল হলো। শুধু পাথরের সমীক্ষা কিংবা ভূ-বিদ্যার পরীক্ষা-নিরীক্ষাই নয়, ঘায়েল হওয়া পাখিগুলোর ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে আসা হলো। প্রচুর পাখির ডিমও পাওয়া গেল। রাত্তিরের খাবারের বন্দোবস্তও হলো। ওই পাখিগুলোকে উষ্ণমণ্ডলীয় জায়গাতেই দেখা যায়। কিছু পাখি ছিল সামুদ্রিক হাঁস জাতীয়।

চার্লস-রা তো ফিরে এলেন। কিন্তু স্টোক্স্-এর নৌকো তখনও ফেরে নি। বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে। চার্লস জিজ্ঞেস করলেন— "ওরা কী করছে?"

"কিছু একটা করছে বলেই তো মনে হচ্ছে।" উইকহাম বললেন।

অল্পসময়ের মধ্যেই ওই নৌকোটাও ফিরল, সঙ্গে কয়েকটা মাছ নিয়ে। মাছগুলোর চেহারা বেশ বড়োসড়ো। মাছগুলো দেখেই চার্লস বললেন— "এ তো হাঙর বলে মনে হচ্ছে?"

"হ্যাঁ, হাঙর।" স্টোক্স্ উত্তর দিলেন।

গোটা পাঁচেক বড়ো মাছ। এর মধ্যে দুটো হাঙর, বাকিগুলো সাগরের বড়ো মাছ, দুটো মাছ বিগ্‌ল্ থেকেই ধরা। ওই শিলাগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে সারাদিনই কেটে গেল। তার সঙ্গে পাখিদের অপ্রত্যাশিত আক্রমণ— সকলেই ক্লান্ত। কিন্তু রাত্তিরের খাবারদাবার ছিল রীতিমতো জাঁকজমকের। পাখি আর পোকামাকড়দের রাজ্যে এমন খাবারের বন্দোবস্ত— রাজসিক তো বটেই। কোথাও কিছু নেই শুধু চারিদিকে জল আর জল, ওই শিলার চূড়াটুকু বাদে ডাঙার চিহ্নমাত্র নেই। তখনও বিগ্‌ল্ বিষুবরেখা থেকে মাত্র ৮০ কিলোমিটারের কাছাকাছি দূরত্বে।

রাতটা তো কাটল। কিন্তু রাত্তিরেই এক অচেনা নৌকো এসেছিল কাপ্তানের কাছে। সেই নেপচুন পাহারাদাররা হাজির। কাপ্তান ফিৎজ রয়-এর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা হলো। তারপর ওরা চলে গেল।

কাপ্তানকে জিজ্ঞেস করলেন চার্লস— "কী বলল ওরা?"

"ওরাই তো নেপচুন পাহারাদার।"

"সে তো দেখেই বুঝেছি। কিন্তু কী বলল?"

"কাল সকালে আসবে।"

পরের দিন সকালে ঠিক হাজির হলো পাহারাদাররা। একজন একজন করে ওরা সবাইকে

জাহাজের পাটাতনের ওপর নিয়ে গেল। ওরা ছিল জনা চারেক। সবার প্রথমে চার্লস-এর পালা ছিল। শুরুতেই চোখ বেঁধে দিল। তারপর নিয়ে গিয়ে চারদিক থেকে ভয়ানকভাবে জল ছুঁড়তে শুরু করল, রং আর পিচের মতো জিনিসের ফেনা সারা মুখে মাখিয়ে দিল। খসখসে লোহার চাকতি দিয়ে ঘষে কিছুটা উঠিয়ে দিয়ে কিছু একটা সংকেত দিল। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক চার্লস-কে জলে ডুবিয়ে দিল। প্রত্যেকের এরকম এক কুৎসিতভাবে মুখে-চোখে রং মাখানো আর জলে ভেজানোর পর্ব চলল বহুক্ষণ ধরে। পুরো জাহাজটা গেল জলে ভরে। কেউ বাদ পড়ে নি, এমন কী কাপ্তানকেও একই অবস্থা করল। এটা হলো আসলে দাড়ি কামানোর উপায়।

সত্যি এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। অনেকের কাছে বেশ উপভোগ্য মনে হলেও অনেকের কাছে আদৌ উপভোগ্য নয়, বরং কষ্টকরই মনে হয়েছে। অথচ ওই জায়গা দিয়ে যাওয়া বেশিরভাগ নাবিকদেরই এ-অভিজ্ঞতা হয়েছে। বিগ্‌ল্ তো দক্ষিণ গোলার্ধে ভাসতে শুরু করেছে। আকাশে ম্যাগেলান-এর মেঘও চোখে পড়ছে। দক্ষিণ গোলার্ধে ম্যাগেলান-এর মেঘ দেখার গল্প সকলেই জানে। চার্লস ম্যাগেলান-এর মেঘ দেখেই বুঝে ছিলেন যে, তাঁরা দক্ষিণ গোলার্ধে। দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে ওই মেঘকে দেখতে কালো পাহাড়ের চূড়ার মতো লাগে।

চার্লস বললেন, "আমার ভাবতেই অবাক লাগছে মাত্র সাত মাসের তফাতে আমি দুই গোলার্ধে রয়েছি।"

ফিৎজ রয় বললেন, "কেন?"

"আগস্টে ছিলাম উত্তর ওয়েল্‌স-এ। সেজউইক-এর সঙ্গে ভূ-বিদ্যার কাজ করছিলাম। এখন হলো ফেব্রুয়ারি মাস, আমি দক্ষিণ গোলার্ধে ম্যাগেলান-এর মেঘ দেখছি! কী অদ্ভুত লাগছে!"

"কিরকম লাগছে?"

"ধারণাই পালটে যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম ঠান্ডার সময়ও এ-সব জায়গায় অসহ্য গরম লাগবে। কিন্তু আদৌ তা নয়। এখন যা গরম, ইংলন্ডে তুলনায় অনেক বেশি গরম লাগে গ্রীষ্মকালে।"

সূর্য অস্ত যাবার সময় হলো। ঘণ্টাখানেক আগে থেকেই ফেরনান্‌দো-কে ভালোমতো দেখা যাচ্ছিল। একটা উঁচু পাহাড়ের চূড়াকে মনে হচ্ছিল যেন সাগরের মধ্যে ঝুলে রয়েছে। কী চমৎকার শোভা! উপসাগরে জাহাজটা নোঙর করার তোড়জোড় চলছে— এমন সময় সুলিভান অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শুশুকের মতো একটা জলের প্রাণীকে ধরলেন। অত বড়ো দেহটা একটা যন্ত্র দিয়ে পুরো বিঁধে ফেলেছেন। প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা প্রাণীটার শরীরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বিঁধেছেন এমনভাবেই যে, তার পালাবার কোনো সুযোগই ছিল না।

ওরকম বড়োসড়ো একটা জীবকে জাহাজে পেতেই চারিদিক থেকে কতকগুলো ছুরি

নিয়ে সকলে মিলে কেটেকুটে ছাল ছাড়িয়ে ফেললেন।

চার্লস তখন দ্বীপটাকে দু'চোখ মেলে দেখছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, পৃথিবীর বাইরে যেন অন্য কোনো গ্রহে পৌঁছেছেন। পরের দিন থেকেই শুরু হলো ঘন সবুজ জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো। চার্লস ভূ-বিদ্যার যা উপাদান দরকার, কোনো কিছুই জোগাড় না করে একবিন্দু জায়গাকেও ছাড়েন না। জাহাজ থেকে টিলাগুলোকে যত উঁচু মনে হচ্ছিল, আদৌ তা নয়। পুরো দ্বীপটাই এক গভীর জঙ্গল। এ-জঙ্গলে কোনো ফাঁকফোঁকর নেই। এক চমৎকার গাছ— ঘন সবুজ পাতাঅলা, বড়ো বড়ো সুগন্ধি মোমের মতো ফুল ধরে— ওরা সারা বছরই সবুজ। এদের পাতা একসময় প্রাচীন গ্রিস দেশে বা, রোম দেশেও সম্মান জানানোর জন্য লোকে ব্যবহার করত। 'লরেল' নামেই এদের সকলে চেনে। বিচিত্র ধরনের রংবেরঙের ফুল। এত ফুল, গাছ অথচ কোনো সুন্দর পাখি নেই, পাখির ডাকও নেই! আর সেন্ট পল্‌স-এর কাছাকাছি একটা শিলার টিলা— তার ওপর পাখিদের রাজত্ব! চার্লস বললেন, "আমি নিশ্চিত উষ্ণমণ্ডলের আসল রূপ এখনও আমাকে ধরা দেয় নি। ফুল, ফলের তো অভাব নেই। তাদের কত রূপ, কী বাহার! তাহলে সুন্দর পাখিরা কি এদের খোঁজ পায় নি?"

সারাদিন ঘুরে ঘুরে চার্লস ভীষণই ক্লান্ত। ক'দিন ধরে রাতে ঘুমের কষ্ট হচ্ছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না। মনে হচ্ছে যেন গরমজলের ওপর শোয়া, কখনো জালের দোলনা কিংবা টেবিলের ওপর শুয়ে কোনো ভাবে একটু আরাম পাওয়ার চেষ্টা— তাতেও বিশেষ লাভ হচ্ছে না। প্রায় না ঘুমিয়েই রাত কাটছে। স্বাভাবিকভাবে চার্লস যেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

অথচ মহাসাগর শান্ত। হালকা বাতাস বইছে। আবহাওয়ার গত কয়েকদিন ধরে কোনো বিশেষ হেরফের হয় নি, দক্ষিণ আমেরিকা-মুখো বাতাসে বিগ্‌ল্ ভেসে চলেছে।

শেষ-না-হওয়া চিঠিটা চার্লস আরো কিছুটা লিখলেন—

২৬ ফেব্রুয়ারি

এখনও বাহিয়া থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে। কিন্তু যাওয়ার পথে ১০ তারিখে ডাক-জাহাজ 'লাইরা'-র সঙ্গে কথা হয়েছে, প্রথম সুযোগেই একটা ছোটোখাটো চিঠি তার মাধ্যমে ইংলন্ডে পাঠিয়েছি। দুর্ভাগ্যজনক হলো ঘর-ফেরত কোনো জাহাজের দেখা পেলাম না, কিন্তু আমার মনে হয় বাহিয়া-য় পৌঁছে ইংলন্ডে চিঠি লেখার সুযোগ পাব। এই চিঠির প্রথম অংশটুকু লেখার পরে আমরা বিষুবরেখা পেরিয়ে এসেছি আর দাড়ি কাটার একটা ঘটনা ঘটেছে। সে এক অদ্ভুত ঘটনা— রং আর পিচ দিয়ে ফেনা বানানো হয়েছিল দাড়ি কামানোর জন্যে আর একটা করাতের মতো ক্ষুর। তারপর নোনা জলে ভরা একটা নৌকোয় আমাদের অর্ধেক ডোবানো হলো। বিষুবরেখার প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে আমরা সেন্ট পল্‌স দ্বীপের শিলাগুলোর কাছে পৌঁছোলাম। অতলান্তিকে এরকম জায়গা সচরাচর চোখে পড়ে না। জনমানবশূন্য এক জায়গা, পাখিদের সাম্রাজ্য। ওদের কাছে মানুষ একেবারেই অচেনা, তাই লাঠি আর পাথর দিয়ে কোনোরকমে ঘায়েল করতে পেরেছি। সেখানে কিছু সময় ছিলাম,

তারপর নৌকো করে শিকার-করা পাখিগুলো সঙ্গে নিয়ে জাহাজে ফিরেছি। ওখান থেকে আমরা রওনা দিলাম ফেরনান্দো নোরোন্হা-র দিকে। ফেরনান্দো নোরোন্হা হলো একটা ছোট্ট দ্বীপ, ওখানে ব্রাজিলের মানুষদের নির্বাসনে পাঠানো হয়। ওই দ্বীপে নামা ভয়ানক শক্ত কাজ। অবিরাম ঢেউ আছড়ে পড়ছে, ফেনায় ভরে যাচ্ছে চারিদিক। এ-সব দেখে-শুনে কাপ্তান ঠিক করলেন যে, পৌঁছোনোর পরের দিনই ওখান থেকে রওনা দেবেন। আমার একটা দিন মহাসাগরের তীরে চমৎকার কেটেছে। পুরো জায়গাটাই গভীর জঙ্গলে ভরা, কোনো ফাঁকফোকর নেই। একবার জঙ্গলে ঢুকে পড়লে চেনা রাস্তা ছাড়া ফিরে আসা বেশ কঠিন। আমি দেখলাম, প্রকৃতির ইতিহাসের এরকম বিরল জায়গা বেশ কাজের, বিশেষ করে ভূ-বিদ্যার জন্য। বাহিয়া-য় সময় বাঁচানোর জন্যে আমি সব লিখে ফেলেছি।

তবে উষ্ণমণ্ডলে গাছপালার ধরনধারণ বেশ দেখার মতো। কোনো আঁকা থেকে নারকেল গাছের বনের ছবি কল্পনা করতে পার, সঙ্গে সুন্দরভাবে এর মেদুরতাও যোগ করে নিও। ইউরোপের কোনো গাছেই এরকম দেখা যায় না। কলাগাছ, আর-এক ধরনের বুনোগাছকে মনে হচ্ছিল কাচের ঘরে রাখা গাছের মতো। আকাশমণি আর তেঁতুলগাছের পত্রপল্লবের নীলচে ভাব খুব নজরকাড়া। কিন্তু কমলালেবু গাছের কোনো বর্ণনা কিংবা ছবি নয়, সাদামাটা একটা ধারণা দেব। আমাদের ওখানকার মতো সবুজ, রোগাটে চেহারার নয়। পোর্তুগালের চিরহরিৎ 'লরেল'-কেও যেন হার মানায় কমলালেবু গাছের শ্যামলিমা, এর চেহারায় অবর্ণনীয় সৌন্দর্য। ফলে-ভরা নারকেল, পেঁপে, হালকা সব্জে রঙের কলা, কমলালেবু গাছগুলো উর্বরা গ্রামকে ঘিরে রেখেছে। এ-দৃশ্য দেখে এত ভালো লাগে যে, তা কোনো বিবরণে তুলে ধরা যায় না।

এইটুকু লিখে রেখেছিলেন চার্লস। লেখা তখনও অসম্পূর্ণ। জাহাজ শান্তভাবে অতলান্তিকে ভেসে চলেছে। পরের দিন বাহিয়া-য় পৌঁছোনোর কথা। বাহিয়া ব্রাজিলের একটা রাজ্য। এর নামই যেন ধারণা দেয় জায়গাটা সম্পর্কে। 'বাহিয়া' কথাটা পাওয়া গেছে পোর্তুগালের 'বাইয়া' থেকে। বাংলায় 'বাইয়া' মানে হলো উপসাগর। সত্যিই তো ব্রাজিলের একেবারে পূর্বপ্রান্তে অতলান্তিকের উপকূলে বাহিয়া শহর। বাহিয়া-র ইতিহাস বহু পুরোনো। ষোলো থেকে ১৮ শতকে বাহিয়া-য় আখ চাষ হতো। এখন আর অত আখ চাষ হয় না। সেই সময়ে আখ চাষের জন্যে আফ্রিকা থেকে দাসদের আনা হতো। যে-কোনো দাসকে শুরুতে ব্রাজিলে চাষের কাজের জন্যেই ব্যবহার করা হতো, পরে অন্যত্র চালান করে দেওয়া হতো। ফলে একসময় দাস বিদ্রোহের অন্যতম জায়গাও ছিল বাহিয়া।

অতলান্তিকের জঙ্গল-ঘেরা বাহিয়া। চার্লস-রা যখন ব্রাজিলের উপকূলে পৌঁছোলেন, সব দেখে তো রীতিমতো অবাক হয়ে গেছেন। এত সবুজ প্রকৃতিতে রয়েছে— এটা ভাবতেই যেন চার্লসের কষ্ট হচ্ছিল। 'অল সেন্টস' উপসাগরে বিগ্‌ল্ পৌঁছোল। ভীষণ সুন্দর শহর— সাদা-সাদা উঁচু বাড়ি, হালকা, সরু অথচ বেশ অভিজাত বাড়ির জানলাগুলো। উপসাগরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনেক জাহাজ দাঁড়িয়ে। চার্লস দারুণভাবে উপভোগ করছিলেন, ঘুরে

বেড়াচ্ছিলেন ব্রাজিলের জঙ্গলে।

রং-বেরঙের বাহারি প্রজাপতি, নানান ধরনের নতুন নতুন পোকামাকড় দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। ফুলেরও প্রাচুর্য কিছু কম নয়। শুধুমাত্র প্রজাপতি আর পোকামাকড়দের দিকে তাকিয়ে থাকলেই এত বৈচিত্র্য ধরা পড়ে। জঙ্গল থেকে ফেরার পথে চার্লস এক বিপত্তির সামনে পড়েছিলেন। ভয়ানক ঝড় উঠল। বনের মধ্যে উপায় কী! গাছের তলায় দাঁড়াতে হলো, দাঁড়িয়ে চার্লস-এর মনে হচ্ছিল, ওই গাছের ছাউনিটা এত ঘন যে, সেখান দিয়ে ইংলন্ডের বৃষ্টির এক ফোঁটাও ভেদ করতে পারবে না। এ-জঙ্গলের রূপ যেন আগে দেখা সবকিছুকেই ছাপিয়ে যায়।

চার্লস একবার ঘুরেফিরে আসার মানুষ নন। নেশা তাঁর নমুনা সংগ্রহের। আবার গেলেন জঙ্গলের ভিতরে, পরের দিন। অসাধারণ রঙের বুনো ফুলের নমুনা সংগ্রহ করলেন, যতটা সম্ভব। তাঁর এত ভালো লাগছিল, মনে হচ্ছিল, এ যেন আরবের রাত্তিরের তুলনায়ও বেশি সুন্দর। সেদিন অবশ্য বেশ ঠান্ডা ছিল, মনোরম বাতাস বইছিল। সেদিন আবার অসম্পূর্ণ চিঠিটা লিখতে শুরু করলেন—

মার্চ, ০১

বাহিয়া বা সান সালভাদোর। আমরা এখানে পৌঁছেছি ২৮ ফেব্রুয়ারি। এক নতুন পৃথিবীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে এই চিঠি লিখছি। বাহিয়া-র পুরোনো শহরের চেহারা কী অপূর্ব তা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। 'অল সেন্টস' উপসাগরের শান্ত জলের ধারে, খাড়াই তীরে, সুন্দর গাছের জঙ্গলে ঘেরা ওই শহর।

যদিও এত কম অক্ষাংশে, তবু অসহ্য কোনো গরম নেই, বরং একটা ভেজা ভেজা আব-হাওয়া। এটা অবশ্য বর্ষার কারণে। আমার এই আবহাওয়াটা বেশ ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, এরকম একটা জায়গায় অনেকদিন ধরে থাকতে। তুমি যদি সত্যি উষ্ণমণ্ডলীয় জায়গার ধারণা পেতে চাও, হামবোল্‌ডট পড়ো। বিজ্ঞানের অংশটুকু বাদ দিয়ে তেনেরিফে-র পর থেকে পড়তে শুরু করো। আমি যত পড়ি, তত তার প্রশংসা না করে পারি না, আইটন-কে বলবে (দেখি, বোনকেও লিখব) আমি কিভাবে আমেরিকা ভ্রমণ উপভোগ করছি। আমি নিশ্চিত যে, সে যদি এখনও শুরু না করে, তার প্রতি আমার দয়া দেখানো ছাড়া কিছু করার থাকবে না।

এই চিঠি পাঁচ তারিখে পৌঁছোবে, তার আগের সময়টুকুর জন্য ভাবছি আমি। অবশ্য পৃথিবীর অন্য জায়গাগুলোর কথা শোনার জন্যে যে-অপেক্ষা— এটা তার সতর্কবার্তা বলেই মনে হয় আমার। কোনো অঘটনের কারণে এভাবে বছর খানেকও কাটতে পারে। মোটামুটিভাবে ১২ তারিখ নাগাদ রিও-র উদ্দেশে রওনা দেব। অবশ্য রাস্তায় কিছু সময় 'আলব্রোলহোস'-এর অগভীর জায়গায় থাকব। আইটন-কে বলবে, আমার অভিজ্ঞতা হলো স্প্যানিশ, ফরাসি ভাষা, হামবোল্‌ডট-এর লেখা পড়ার দরকার। সঙ্গে আঁকা শেখা। যদি তার সঙ্গে দেখা না-ও হয়, আশা করছি দক্ষিণ আমেরিকার কথা শুনব। আমি রিও-তে পৌঁছে

চিঠি পাওয়ার আশায় থাকছি, যদি তার উত্তর না পাও তবে পরের চিঠিতে আগের তারিখটা উল্লেখ করবে।

সারি সারি জাহাজগুলোকে পেরিয়ে এগোচ্ছি আমরা। আমাদের সেনাপতি বলেন যে কাউকে অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই আমাদের, কারণ তুলনায় আমরা সবকিছু ঠিকঠাকই করি। নৌবাহিনীর বিষয়েও আমার আগ্রহ জন্মেছে, বিশেষ করে এখন। কারণ সকলেই বলে আমরাই নাকি দক্ষিণ আমেরিকায় প্রথম। আমার মনে হয় কাপ্তান এক অসাধারণ আধিকারিক। আজকে যেভাবে পাল গুটিয়ে 'সামারাং'কে পেরিয়ে এলাম, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সাগরের মাপজোক করার মতো একটা জাহাজের পক্ষে যুদ্ধ জাহাজকে অতিক্রম করে যাওয়া—এক অভূতপূর্ব ঘটনা। আসলে 'বিগ্‌ল্' তো সে-ধরনের জাহাজ নয়। এরাসমাস যখন শুনবে, রাত্তিরে আমি জাহাজের পেছনের দিকে ও মাস্তুলের মধ্যে বসে ছিলাম, সে সব বুঝতে পারবে। এ-ধরনের অদ্ভুত চিঠি লেখার জন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো। সারা দিনের পরিশ্রান্ত অবস্থায় সাধারণভাবে আমার এ-চিঠি লেখা। অবশ্য নোটবই-এ লেখাগুলো আরো বিস্তৃত। সেগুলো পড়লে আমার দেখা জায়গাগুলো সম্পর্কে পুরো একটা ধারণা পাবে। আমার কাছে এই অভিযান অসাধারণ মনে হচ্ছে, যদিও জানি তোমার জ্ঞানভাণ্ডার এই পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, এমনকি ঠিক উলটোটা ভাববার সুযোগও প্রচুর। আমার মনে হয়, আমাকে কেউ একই পরিস্থিতিতে জিজ্ঞেস করলে হয়তো আমি সেরকমই কোনো উত্তর দিতে পারি, তাকে উৎসাহ দেওয়ার বিষয়ে সাবধান হব। আমার এখন আর কাউকে লেখার মতো সুযোগ নেই। তুমি মেয়ারে জানিয়ে দিও, আমি উষ্ণমণ্ডলীয় এই শোভা দেখার সুযোগ পেয়েছি তাদের জন্যে— এ-কথা কখনো ভুলব না। আর দুঃখ দেব না, কিন্তু এই নিখাদ আনন্দের মধ্যেও আমি অতি উৎসাহী হয়ে উঠি নি।

বাড়ির সকলকে এবং ওয়ন্‌স্‌-কে আমার ভালোবাসা জানিও।

উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে অন্যান্য ভালো জিনিস, তাদের বেড়ে-ওঠার মতো করে আমি ভাবি একজনের স্নেহের কথা।

এক নতুন জগতে পা ফেলার যে-প্রত্যয়, আমার দৃষ্টিতে চমৎকার, বলতে সাহস হয় না যে, এরকম জায়গা থেকে তোমার ছেলের চিঠি পাওয়ার পরেও তোমার কাছে তা অতটা নয়।

আমার প্রতি বিশ্বাস রেখো বাবা।

তোমার অত্যন্ত স্নেহধন্য,
চার্লস ডারউইন।